পুনশ্চ ও অনাবৃত

বিমল কর

সাহিত্য সংস্থা
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রনধীর পাল
১৪ এ টেমারলেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৬৫

প্রচ্ছদ শিল্পী
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

মুদ্রণ
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১।১, দিনবন্ধু লেন,
কলিকাতা-৬

মিতালি মুখোপাধ্যায়
কল্যাণীয়াসু

আজ আবার ওই রকম হল।

সকাল থেকে শরীর কিন্তু আমার ভালই ছিল। শীতের মাঝামাঝি, 'সিজিন্যাল অ্যাজমা' গোছের শ্বাস-প্রশ্বাসের একটা কষ্ট আমার হয় আজকাল। সে পাট চুকে গিয়েছে। এখন মরা শীত। উত্তরের বাতাস দিক পালটে দক্ষিণমুখো হয়ে আসছে। ফাল্গুনের শুরু বুঝি আর দিন কয়েক পরেই।

সকালে ঘোরাফেরা করার সময় আর আগের মতন ঘন কুয়াশা দেখি না। হিমে-শিশিরে যেভাবে ঘাস ভিজে থাকত আগে, সূর্যছটায় চিকচিক করত জলবিন্দু—এখন আর তা চোখে পড়ে না। চারদিক কেমন শুকনো-শাকনা, গাছের মরা পাতায় ধূলো জমেছে। নতুন ডালপালাও বেড়ে উঠেছে আস্তে আস্তে।

আজ সকালে বেড়াবার সময়েই নজর করেছি, ছেলেদের খেলার মাঠের ওপর মলমল কাপড়ের মতন পাতলা, খুবই হালকা একটু কুয়াশা ছড়ানো। মাঠে ছেলেরা কেউ নেই। আরও তফাতে রোদের ঢল, একটু ধোঁয়াটে ভাব মেশানো।

গুহ এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মাঠের কাছেই দেখা। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী জোড়ে সকালে বেড়াতে বেরোন। গুহ সৌম্যদর্শন, সুহাস্যময় পুরুষ। যথার্থ ভদ্রজন। তাঁর স্ত্রী অতীতে অবশ্যই সুন্দরী ছিলেন, এখন ভাঙা-শরীর, খানিকটা রোগা-রুগ্‌ণই দেখায়। ওঁকে দেখলে আমার অতসী কাকীমার কথা মনে হয়। সেই ধরনের ছাঁচ চোখমুখের, গড়নের। এই প্রৌঢ় দম্পতির নিবিড়তাকে আমি মাঝে মাঝেই মুগ্ধ হয়ে দেখি।

গুহ ও তার স্ত্রীর মুখোমুখি হতেই দুজনে হাত তুলে নমস্কার জানালেন। গুহর হাতে সরু ছড়ি। মাথার দিকটা তামায় বাঁধানো

গুহ-গৃহিণীর গায়ে নকশা-করা মেয়েলি শাল, এলোমেলো কাঁচাপাকা চুলের সিঁথির তলায় সিঁদুর ঝরে লেপটে রয়েছে, মাথায় কাপড়। পায়ে মেয়েলি জুতো—কাপড়ের।

দু পাঁচটা মামুলি কথা হল। 'ফিরছেন না কি?' 'শীত চলে গেল' 'কাল বার বার লোড শেডিং হয়ে বড় জ্বালিয়েছে রাত্তিরের দিকটা।'

গুহ-গৃহিণীকে আমিই বললাম, "আপনি ভাল তো?"

উনি একটু হাসলেন।

গুহ হাসির গলায় বললেন, "খুব ভাল। মুখ দেখে বুঝতে পারছেন, না! আজ মেয়ে আসছে, নাতি আসছে…। বেলা এগারোটা বড় জোর, তারপর কোথায় ব্লাড সুগার আর প্রেশার…। মেয়ে নাতির মুখ দেখলে সব শিকেয় উঠবে।"

গুহগিন্নি খুশির চোখে তাকালেন। তাঁর চোখ দেখে মনে হল, তিনি যেন মনে মনে সময় গুনছেন।

"আচ্ছা আসি—" বলে পা বাড়াতে গিয়েই গুহর কী যেন মনে পড়ে গেল। আমায় বললেন, "ভাল কথা, আপনার চোখের জন্যে আমি একটা ওষুধ পেয়েছি। হাওয়ার্থের বইয়ে দেখলাম…"

"এখন তো ভালই আছি,', আমি হেসে বললাম।

"বেশ ভাল আছেন। চমৎকার ফিট দেখাচ্ছে আপনাকে। তবু মশাই, আমি বলি কী, ওষুধটা জেনে রাখা ভাল। ব্যবহারও করা যেতে পারে। হোমিওপ্যাথি ওষুধের কোন ব্যাড এফেক্ট জেনারিলি থাকে না। অ্যালোপাথ ডাক্তারগুলো যা পারছে খাইয়ে খাইয়ে মেরে ফেলল আমাদের। তা আপনাকে আমি ওষুধটা লিখে দেব। 'রুটিন' থেকে তৈরি মনে হল। পাওয়া গেলে হয়!"

"দেবেন দেখব।"

গুহ দম্পতি পা বাড়ালেন। আজ ওদের খুশির দিন। মেয়ে-জামাই থাকে মাইথনে। জামাই এনজিনিয়ার। একটিমাত্র

সন্তান ওঁদের। সেই মেয়ে আসছে, নাতিও। জামাই আসছে কি না বললেন না।

গুহ হোমিওপ্যাথি চর্চা করেন। নেশা। পেশায় জীবনে ছিলেন পুলিস অফিসার। ওপরঅলার সঙ্গে মানাতে পারতেন না বলে ঘন ঘন বদলি হতেন। তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল বদলি অফিসার। মানুষটির মধ্যে কিসের এক অহংকার আছে। হয়ত আভিজাত্যের। জমিদার বংশজাত সন্তান। কিন্তু সুজন।

গুহ চলে যাবার পর মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পাতলা কুয়াশাটুকুও মিলিয়ে গিয়েছে। সবই স্পষ্ট: মাঠ, গাছ, জল-টাঁকি, চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ির সার। মন্দিরের মাথার চূড়োর মতন করে একটা বাড়ি হচ্ছে, তার মাথাটাও দেখা যাচ্ছিল।

না, আমার চোখের গোলমাল এখন নেই। সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কাক উড়ে গেল, একটা বাস আসছে। সকালের বাস। কুণ্ডলিপাকানো কুকুরছানা—। কোনো কিছু দেখতেই আমার অসুবিধে হচ্ছিল না। আমি চমৎকার আছি; কোনো গোলমাল নেই।

বাড়ি ফিরে দেখি ছায়া বাজার যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ছায়া আমাদের বাড়িতে কাজ করে। বছর বাইশ-চব্বিশ বয়েস। মেয়েটি ভাল। তার স্বামী লিলুয়ায় অন্য বউ নিয়ে থাকে। ছায়া থাকে মায়ের কাছে। স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে।

ইন্দিরা ওকে টাকাপয়সা দিচ্ছিল। কী কী আনতে হবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

আমি বললাম, "আমিই যাই ওর সঙ্গে।"

"আপনি?"

"কী হয়েছে। যাই তো··· ।"

ইন্দিরা বলল, "এই বেড়িয়ে ফিরলেন। বিশ্রাম করলেন না।

জলটুকুও খেলেন না—।" বলতে বলতে একটু মাথা নাড়ল ইন্দিরা, মানে এখন আমার বাজার-যাওয়া তার মনোমত নয়।

"এসেই খাব। আমার ক্লান্তি লাগছে না। সামনেই বাজার।"

ইন্দিরা আর কিছু বলল না। শ্বশুরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি সে করে না। করার কারণও হয় না। বুদ্ধিমতী মেয়ে। তবে কখনও কখনও শ্বশুরমশাইয়ের বাড়াবাড়ি দেখলে নিজের অপছন্দও বুঝিয়ে দেয়।

বাজার যাবার ব্যাপারে তেমন কিছু ছিল না। সামনেই বাজার। মিনিট পাঁচেকের পথ।

ছায়াকে নিয়ে বাজারমুখো হলাম। ছায়া আমার পেছন পেছ আসতে লাগল।

বাজার-করা কোনো কালেই আমার নেশা ছিল না। তবে একটা অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিনতা বরাবরই বলত, আমার বাজার-যাওয়া মানে পয়সা নষ্ট। যার তার কাছে ঠকে আসা। তবু আমিই তো একসময় বিনতার বাজার সরকার ছিলাম।

পয়সা নষ্ট করার কথাটা বিনতার মুখের মাত্রা। মেয়েরা অমন বলেই থাকে। নষ্ট করার মতন পয়সাই বা আমাদের কোথায় ছিল সে সময়ে। সোওয়া শ' টাকার মতন মাইনে, ঘরভাড়া পঞ্চাশ। বাকি পঁচাত্তর টাকায় সংসার : খাওয়া-দাওয়া, অফিস আসা-যাওয়া, মেয়েটাকে মানুষ করা, ধোপানাপিত, এসো জন বসো জন···পঁচাত্তরে কি কুলিয়ে ওঠা যায়? অভাব অনটন তখন আমাদের নিত্যদিন গা আঁচড়াত। এক একসময়ে সেই আঁচড় এত বেশি ধারালো হয়ে উঠত যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী পাড়ার কুকুরের মতন ঝগড়া করতাম। আমাদের ভাষাটাষাও ভদ্রবাড়ির মতন হত না। পরে মাথার রক্ত নেমে গেলে দু জনেই মনে মনে আফসোস করতাম অবশ্য। বিনতার চোখ ছলছল করত, আমার মুখ কালো হয়ে থাকত।

টাকার জন্যে তখন হরি সাউ বলে একটা লোক, আমার বাড়িঅলা

এক্সিডেফিট করিয়ে যে 'রায়' হয়েছিল—হরিরাম রায়, তার 'রায় বুক স্টোর্স' বইয়ের দোকানের জন্যে আমাকে দিয়ে বাচ্চাদের বই লিখিয়ে নিত। বই মানে, মানের বই। আমার যা কেরানি বিদ্যে তাতে 'কোকনদ' শব্দের মানে 'গোলাপফুল' লিখলেও ক্ষতি হত না। পাঁচ সাত হাজার মানের বই হাটেমাঠে বিক্রি হয়ে যেত দু বছরে। হরি সাউ আমাকে দিয়ে একটা বই লেখাল, 'সরল গীতা' পকেট সাইজের। বইটার নাম হওয়া উচিত ছিল 'শ্রাদ্ধ গীতা' বা 'গীতা শ্রাদ্ধ'। তার পরই লেখাল 'দাম্পত্য জীবনের গুপ্তকথা'। লোকটাকে দেখতে ছিল ভাল্লুকের মতন, বারোমাস পায়ে মোজা পরত, বিড়ি খেত বাণ্ডিল বাণ্ডিল। ব্যবসাবুদ্ধি ছিল পাকা। যদু মধু যে কোনো নামে বই ছেপে সে লাটের দরে গাঁয়েগঞ্জে ছড়িয়ে দিত।

হরিকে আমি ছেড়ে দিলাম। যে-লোকের বিন্দুমাত্র শখ বা নেশা নেই মাছ ধরার তাকে জোর করে ছিপ হাতে পুকুরের সামনে বসিয়ে দিলে যা হয়—আমার হয়েছিল সেই অবস্থা।

তা ছাড়া আমার বরাত একটু খুলে গেল। এক বন্ধু কারখানা খুলেছিল বাগমারিতে। নলিনাক্ষ। নলিনাক্ষ সামন্ত। সে আমাকে একদিন ধরে ফেলল। কয়েকটা ছেলে ফুটবল মাঠ থেকে ফেরার সময় এসপ্লানেড ট্রামগুমটির কাছে দাঁড়িয়ে হল্লাবাজি আর নোঙরামি করছিল। তাদের সঙ্গে আমার যখন হাতাহাতি হবার অবস্থা—তখন নলিনাক্ষ আমায় দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে ধরে ফেলল। নলিনাক্ষ জানত আমি মাঝে মাঝে রগচটা হয়ে কেচ্ছামেচ্ছা করে ফেলি।

ভাগ্য বলে কিছু আছে তখন থেকেই আমার বিশ্বাস। সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য যাই হোক। নলিন, মানে নলিনাক্ষ আমাকে তার কারখানায় টেনে আনল। বলল, তোমার দুপুরের অফিসের কাজে বাগড়া দিতে চাই না। সন্ধেবেলায় আমার কারখানায় জমা-খরচ লিখবে।'

পয়সার মুখ একটু যেন উঁকি দিল তখন থেকে। বিনতা বলল,

'ভগবান এবার যদি একটু মুখ তুলে চান !'

চার পাঁচ বছরের মাথায় ভগবানের নজর ঠিকঠাক আমার উপর পড়ল। নলিন আমাকে ম্যানেজার করে দিল তার কারখানার। সমস্ত স্টিল ফার্নিচারস-এর আমি হলাম ম্যানেজারবাবু। টাকাপয়সা, লেনদেন, কারচুপি, সেলস্ ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স সবই আমার হাতে। তরু ততদিনে বড় হয়ে গিয়েছে ; অন্তর বয়েস হয়েছে বছর আট-দশ। আমরা মানিকতলার দিকে থাকি। বাড়িভাড়া সাতশো মতন।

নলিন তার ব্যবসায় হাউইয়ের মতন উঠছিল তখন। ওদিকে এক নামকরা গুরু ধরেছিল। গুরুকৃপায় সে রাজা হল। প্রায় এক প্রাসাদই গড়ল কাঁকুড়গাছিতে। অবশ্য তাদের যোগীপাড়ার পৈতৃকবাড়ি ভাগাভাগি আর বিক্রিবাটরার টাকাও পেয়েছিল।

নলিনের বুদ্ধিতে আর বিনতার তাগাদায় আমারও একটুকরো জমি হয়েছিল নতুন শহরের বালি-জমিতে। একতলা এক বাড়িও হল। আর বিনতাও মারা গেল। বাড়ি তার কপালে সইলো না।

নলিনেরই বা কতদিন সইলো বলা মুশকিল। কতকগুলো পারিবারিক গণ্ডগোলে, মেজো ছেলের অ্যাকসিডেন্ট-এ মারা যাওয়ায় —নলিন যেন চিড় খেয়ে ভাঙতে ভাঙতে একদিন পুরো ভেঙে গেল। চলে গেল বরাবরের মতন। যাবার কিছু কাল আগে আমায় বলেছিল, 'বিশু, আমি তোমার বন্ধু ছিলাম, আমার ছেলেমেয়েরা তোমার বন্ধু নয়। ওরা তোমায় কাকাই বলুক আর মামাই বলুক—তোমাকে সুনজরে দেখে না। আমি চলে যাবার পর তুমি ওদের হাতে চেস্টের চাবি' খাতাপত্র গচ্ছিত করে দিয়ে চলে যেও। তোমার আর ভাবনার কী আছে! জীবন শেষ করে এনেছ। ছেলে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তোমার মেয়ের কথা তুলব না, দুঃখ পাবে। তা দুঃখ তো আরও অনেক পেয়েছ জীবনে, সহ্য করেছ। তোমাকে যেন আমার ছেলেরা গলাধাক্কা দিয়ে না তাড়ায়, তার আগেই তুমি চলে যেও।'

বাজারে আসতেই ছায়া বলল, "বাবা, আজ আর মাছ লাগবে না, বউদি বলেছে। কালকের মাছ আছে। ও-বেলা বউদিদেরও নেমন্তন্ন।"

ছায়া আমায় বাবা বলে। ডাকটা প্রথম দিন আমার কানে লেগেছিল। এখানে দেখেছি মেসোমশাই মাসি ডাকটাই সচল। ছায়া কেন যে আমাকে বাবা বলে জানি না। ওর মাও আমাকে ঠাকুরবাবা বলে। কেন কে জানে! আমি বামুন-টামুনও নই যে আমাকে খাতির করে ঠাকুর বলতে হবে। তা মেয়েটা 'বাবা' বলে ডাকলে আমার খারাপ লাগে না। বরং ওর সরু, সামান্য আদুরে গলায় 'বাবা ডাকটা ভালই লাগে।

ছায়ার দিকে দু চার পলক তাকিয়ে থাকলাম 'দাদা-বউদির নেমন্তন্ন।...ঠিক আছে, চল সবজির দিকে যাই।"

অন্তু আর ইন্দিরার আজ কিসের নেমন্তন্ন সন্ধেবেলায় বুঝতে পারলাম না। বিয়ে-থায়ের নাকি? পাড়ার কোনো বাড়িতে বিয়ে হলে নিমন্ত্রণ-পত্রটা আমার নামেই আসত। জানতে পারতাম। অন্য কিছুর হবে। পরে জানতে পারব।

আমার ছেলে আর ছেলের বউয়ের দোষত্রুটি আমি ধরি না। ধরার কারণও নেই। অন্তু ছেলে হিসেবে হীরের টুকরো না হোক রুপোর টুকরো তো বটেই। ভদ্রসভ্য, কাজপাগলা, পড়াশোনা করতে ভালবাসে, হই হল্লাতেও কম নয়, নেশাফেশা করে না। ওর বাপই বরং একসময় বেণীর দোকানে এক আধ বোতল দেশী খেত। তখন যে সে নোংরা খরখরে দেওয়াল-চুঁইয়ে পড়া দারিদ্র আর দুঃখের মধ্যে ডুবে ছিল। হরি সাউয়ের হুকুমে চার ক্লাসের ছেলেদের পড়ার জন্যে মানের বই লিখছে।

"বাবা?"

"উঁ? কী বলছিস?"

"কচি নিমপাতা উঠেছে—উই যে…"

আমি সবই দেখতে পাচ্ছিলাম। আমাদের বাজারটা ছোট ছিল দু বছর আগেও। এখন কত বড় হয়ে গেছে। চেনা সবজিঅলা সব। চাঁদু, শিবু, বঙ্কু, পাত্র…। কারুর কাছে আমি কাকাবাবু, কারোও কাছে মেসোমশাই।

শীতের শাকসবজির কদর কমছে এখন, কপি কড়াইশুঁটি, পালনশাক নিয়ে চাঁদুদের যেন মাথাব্যথা কমে গিয়েছে।

"বাবা ?"

"শুকনো এঁচোড় দেখেছিস বুঝি! সজনে ডাঁটা ? …ওসব এখন খায় না এই এঁচোড় সেদ্ধ হবে না। চোদ্দ ষোলো টাকা কিলো। বউদি তোর গলা কাটবে। নে, নিমপাতা নিয়ে নে। নিয়ে আলুর দোকানে চল।"

আমার ছেলের বউকে বিনতাই পছন্দ করে রেখেছিল। তার কোন কসবা-বউদির মেয়ে। ইন্দিরা—আমার ছেলের বউ গুণী মেয়ে। বটানিতে ভাল রেজাল্ট করেছিল। এখন একটা স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ায়। দেখতে পরী নয়, তবে সুশ্রী। ব্যবহারটিও ভাল। সংসারী। অল্পস্বল্প রাগ আছে। বরিশালের রক্ত রয়েছে গায়ে।

ছেলে আর ছেলের বউ সম্পর্কে আমার অভিযোগ শুধু এক জায়গায়। নাতিটার এখনও পুরো পাঁচ বছর বয়েস হল না—এখন থেকেই তাকে সাহেব তৈরির খাঁচায় ঢুকিয়েছে। ফিরিঙ্গি স্কুলে পড়ে। মতলব ছিল বাইরের নামকরা স্কুলে ঢুকিয়ে হোস্টেলে রেখে দিয়ে আসবে। সুবিধে করতে পারেনি। নাতি আজ নেই শনিবার দিন মা গিয়ে মামার বাড়িতে রেখে এসেছে। কাল পরশু ফিরবে।

তা ছেলে তোমাদের। যা ভাল বুঝবে করবে, বাবা!

বিনতা বেঁচে থাকলে এমন হত না। সে জানত, দাবি জিনিসটা একতরফা হতে দিতে নেই।

"আচ্ছা একশো নিচ্ছি, বাবা।"

"নে।"

"ওই দোকানে দেখো, কচি শশা রয়েছে। গন্ধ লেবু!"

"তোর যা খুশি নে।"

"বউদি বলেছে কম করে সবজি নিতে। জমে যাচ্ছে।"

"যা নেবার নিয়ে নে।"

"এখান থেকে মুদির দোকানে যেতে হবে।"

"যাওয়া যাবে।"

গায়ের পাশে কর্নেল চৌধুরী। আর্মিতে ছিলেন। রিটায়ার করে ঘরবাড়ি করেছেন এখানে। অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি করেন।

"হ্যালো স্যার! গুড মর্নিং!"

"মর্নিং! ভাল আছেন?"

"ভাল কি আপনারা থাকতে দেবেন? দু বেলা ফাইল হাতে ছোটাছুটি! ...ওহে ত্রিলোচন, মাঝারি সাইজের আলু দিও। এক-কোয়া রসুন আনলে না? বলেছিলেন যে! কী! আশি টাকা কেজি! বলো কী!"

"আমি এগোই কর্নেলসাহেব।"

"আসুন। ...আপনার শরীরটরীর ভাল?"

"ভাল।"

"চোখমুখ তাই বলছে। সকাল বিকেল হাঁটছেন?"

"সকালে হয়। বিকেলে বড় একটা..."

"বিকেলেও বাদ দেবেন না। শীত তো চলেই গেল। ...দেখুন মশাই, আজকালকার দিনে সত্তর পঁচাত্তর কিছু নয়। বেঁচে থাকার ইচ্ছের মধ্যে একটা লাইফ ফোর্স আছে। লাইফ ভাইটাল। ...আই হোপ ইউ আর বিলো সিক্সটি ফাইভ... !"

"ওই রকম। আচ্ছা আসি।"

বাজার সেরে চন্দ্রবাবুর মুদির দোকান। এক প্যাকেট সিগারেট কিনলাম বাইরের পানঅলার কাছ থেকে। কতক ফুলআলি বসে

আছে। পুজোপাটের ফুল বেচে। আমাদের বাড়িতে ও-পাট নেই। বিনতার সময় ছিল। এখন তার ঠাকুরঘরে সন্ধেবেলায় বাতিটা জ্বেলে দেওয়া হয়। কোনো কোনো দিন ধূপ জ্বালাও হয় দেখেছি।

শুধু সকাল কেন, বেলার দিক, দুপুর, বিকেলও আমার ভাল কাটল। কোথাও কোনো গণ্ডগোল বোধ করলাম না। বউমা—মানে ইন্দিরা দুপুরের পর পর স্কুল থেকে ফিরে এল। কথা বলল! সন্ধেতে অন্তুর এক বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন। এমনি। কোনো অনুষ্ঠান নয়। চা করে দিল ইন্দিরা।

বিকেলে বাড়ির কাছে পায়চারি করলাম সামান্য। বেলা কেমন বেড়ে গিয়েছে। ক'দিন আগেও ঝপ করে অন্ধকার নেমে আসত। এখন তো রোদের আভা মিটতেই সাড়ে পাঁচটা বেজে যায়।

আমি মরা শীতের গোধূলিও দেখলাম।

অন্তু এসে গেল।

"বাবা, আমরা মিল্ক কলোনির দিকে যাব। নেমন্তন্ন। ন'টার আগেই ফিরব।"

"বউমা বলেছে।"

"তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। ছায়া একটু দেরি করে বাড়ি ফিরবে আজ। আর তুমি তো সাড়ে ন'টার আগে রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়াও করো না। আমরা ন'টার আগেই ফিরে আসব।"

"ঠিক আছে। তোদের হুড়োহুড়ি করতে হবে না। সুবিধে মতন আসবি।"

"না, না, আমরা আগেই ফিরব। এটা এমনি নেমন্তন্ন, কোনো অকেশান নয়।"

অন্তু আর বউমা বেরিয়ে গেল। তখন সন্ধে হয়েছে। দু' জনেরই সাধারণ সাজগোজ। বোঝাও যাচ্ছিল, একেবারে ঘরোয়া নেমন্তন্ন।

ছায়া আমাকে চা করে দিল আবার। ওকে আমি ছেড়েই দিলাম। অকারণ আমার জন্যে বসে থাকবে কেন! ছায়া যেতে চাইছিল না। আমি জোর করেই পাঠিয়ে দিলাম। খাল-টাল পার হয়ে বাস ধরে যেতে হয়। বয়েসটা কম। ফাঁকা রাস্তাঘাট। বদ-বজ্জাতের তো অভাব নেই। রাত করা উচিত নয়।

ছায়া চলে যাবার পর ঢাকা বারান্দায় বসে থাকলাম খানিকক্ষণ। বাইরে লাইট পোস্ট আছে, আলো জ্বলে না। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। তারা ফুটেছে অনেক। শীতেরও নয় বসন্তেরও নয়—কেমন এক এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছিল।

নিজের ঘরে এসে শুয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। সংসারের কথা আর আমি ভাবি না। ছেলে-বউ ও নিয়ে মাথা ঘামায়। তবু সংসারী মানুষের যা হয়—কোথাও না কোথাও দু একটা গিঁট যেন জড়িয়ে যায়। এক একবার মনে হয়, দোতলার খানিকটা করলে হত। আবার ভাবি কী লাভ! বৃথাই খানিকটা ইট লোহা সিমেণ্টের হিসেব করলাম মনে মনে। বিনতার খুব শখ ছিল, দোতলায় একটা হলঘর মতন করবে। সাজাবে নিজের হাতে। ওর সাজসজ্জার নকশাটা হবে দেশী। নেয়ার-বোনা বসার জায়গা, ভাল বেতের সেটি, মোড়া, মোরাদাবাদী সতরঞ্জি, খাট্টুসের পরদা, আরও কত কী… !

আমি ওকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলতাম, তোমার এত শখ হয় কেন বলো তো! আমি তুমি—আমরা তো ভিখিরিই ছিলাম, দেড় টাকার তোলা উন্নুন কিনে সংসার শুরু করেছিলাম, আর এই মরার সময় ঘর সাজানো কেন?

বিনতা যা বলত জবাবে তা সব মেয়েরাই বলে থাকে। 'ঘর কি আমার? তোমাদের। তোমাদের জন্যেই সাজানো। গাছ পুঁতলে দুটো ফুল ফুটুক—এ তো সবাই চায়।'

এক একদিন চুপচাপ বসে থাকলে বা শুয়ে থাকলে কী যে হয় বুঝি না—কোন্ লুকোনো দরজা দিয়ে যে বিনতা ঘরে ঢুকে পড়ে কে জানে!

যে-মানুষটা নেই সে যদি এইভাবে আসে যায়, ভালও লাগে—আবার মন্দও লাগে।

ক'টা বাজল কে জানে!

উঠে পড়লাম। শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না।

বাথরুমের জানলাটা বন্ধ ছিল না বোধ হয়। দমকা বাতাসে বন্ধ হয়ে গেল শব্দ করে। একবার দেখা দরকার। পুজোর পর আচমকা ঝড়বৃষ্টিতে দুটো কাচ ভেঙেছে এ-বাড়ির।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে কিছু না ভেবেই সোজা বসার ঘরে চলে গেলাম।

একটা বাতি জ্বলছিল। কম জোরী। বাহারী শেডের মোটা কাচের দরুন আলো আরও ম্লান দেখাচ্ছিল।

টিভিটা খুলে দিলাম।

ওই যে কে কবে হারিয়ে গিয়েছে, কোথা থেকে, কাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—কে কবে থেকে ঘরছাড়া—নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা—এই সবের খবরটবর জানায়—সেই খবরগুলো জানাচ্ছিল। তাদের ফটোও দেখাচ্ছিল। একটা বছর দশেকের ছেলে, একটি কিশোরী মেয়ে, জোয়ান এক ছোকরা, আধ বয়েসী পাগলা এক, যুবতী একজন অবাঙালি মেয়ে এদের কথা বলতে বলতে, ছবি দেখাতে দেখাতে হঠাৎ এক মহিলার মুখ দেখাল। কী নাম বলল? রমলা! না, রমলা নয়—, কমলা। কমলা দেবী। বয়েস সাতান্ন। রং ফর্সা। মাথায় মাঝারি চিবুকের তলায় আঁচিল। গলার বাঁ পাশে কাটা দাগ। গলার স্বর ভাঙাভাঙা, চোখের মণি কটা রঙের। ইনি গত সাত দিন হল বাগবাজারের বাড়ি থেকে নিখোঁজ। গায়ে সামান্য অলঙ্কার ছিল। পরনে তাঁতের শাড়ি। কিছুদিন থেকে মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে ভুগছিলেন। এঁর সন্ধান পেলে যেন···

কমলা! কমলা দেবী? থুতনির তলায় আঁচিল। গলার বাঁ পাশে কাটা দাগ....চোখের মণি কটা রঙের? ওই ছবি? মুখটা দেখতে

দেখতে হঠাৎ সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল। আলো কি চলে গেল? লোড শেডিং?

না, আলো যায়নি। টিভি চলছিল যে বুঝতে পারছিলাম। শব্দ হচ্ছিল। ঠিকানা বলছিল মেয়েলি গলায়···

আমি বুঝতে পারলাম, আমার দৃষ্টি চলে গিয়েছে। এই রকমই হয় আমার। হঠাৎ হঠাৎ আমি দৃষ্টিহীন হয়ে যাই। অন্ধ।

আজ আবার হলাম। কমলার ছবি দেখতে দেখতে। ছবিটা যেন আমার মনের তলায় দুলতে লাগল। দুলতে দুলতে কখন স্থির হয়ে গেল। কমলা। সেই কমলা। এক সময়ে যে আমার ছিল। আমার স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রী।

॥ দুই ॥

এটাই আমার অসুখ। চোখের।

পুরোপুরি চোখের, না, মনেরও একটা বড় অংশও রয়েছে তা আমি বলতে পারব না। ডাক্তাররা নানা রকম বলে। ছোট বড়, কলকাতা মাদ্রাজ—ডাক্তার তো কম দেখালাম না। এখন প্রায় বেশির ভাগ চোখের ডাক্তারই ধরে নিয়েছে—ঘটনাটা অদ্ভুত, তাদের পড়া বিদ্যেয়, পেশাদারি অভিজ্ঞতায় ধরা যাচ্ছে না, এরকম বিচিত্র ঘটনা কেন ঘটে! রিজন্ নট্ নোউন—এই হল তাদের কথা।

প্রথম যখন এই রকম ঘটে, বছর দেড়েক আগে, আমি যে কী ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম বোঝাতে পারব না। প্রথম ঘটনাও ঘটেছিল বিকেলের দিকে। সেদিন কী বৃষ্টি কী বৃষ্টি! সকাল থেকে আকাশ আর থামছে না। বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। ভাদ্র মাসই। অন্তু অফিস বেরোতে পারেনি। ইন্দিরাও স্কুলে যায়নি। যিশু—মানে

আমার নাতিটি বাড়িতে বসে বসে উৎপাত করছে নানা রকম।

বিকেলে মনে হল, বৃষ্টির তোড় যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। আকাশজুড়ে রাত নামার মতন অন্ধকার। যত মেঘ ডাকছে, তত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আর সে কী বিদ্যুৎ চমকানি! আকাশ-বাতাস চিরে ঝলসে যেন এক প্রলয় হচ্ছিল।

ঝোড়ো বাতাসে জানলা কাঁপছিল, শব্দ হচ্ছিল ঠকঠক, বৃষ্টির ছাটে জানলার তলা দিয়ে জল এসে পড়তে লাগল। আমি আমার ঘরের দক্ষিণের একটা জানলার তলার দিকের ভাঙা ছিটকিনিটা লাগাবার চেষ্টা করছিলাম। যেন তোড়ে জল আসছিল। এমন সময় চোখ ধাঁধিয়ে এক বিদ্যুৎ চমকাল। বজ্রপাত ঘটল কাছাকাছি কোথাও। আর আমি ভয়ে সেই যে চোখের পাতা বুজলাম, তারপর সব অন্ধকার।

চোখের পাতা খুলেও আর যে কিছু দেখতে পাই না। এ কী! আমার চোখে কি বিদ্যুতের ঝলক লাগল? আমার চোখের তারায় কি ঝলসানি লেগে কিছু হল?

দু চার মুহূর্ত কাটল। চোখ রগড়ালাম। অন্ধকার। কিছুই যে দেখতে পাই না। ভয় পেয়ে অন্তুদের ডাকলাম। ওরা ছুটে এল।

তারপর কত কী—! অন্তু আর ইন্দিরা কম চেষ্টা করল না। জলের ঝাপটা, গোলাপজল, আই লোশন; এক ডাক্তারকে ফোন করল অন্তু বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে অন্য লোকের বাড়ি থেকে। ডাক্তার বলল, কাল এসে দেখবে।

ধীরে ধীরে আমার মনে এক ভয়ংকর আতঙ্ক জমা হতে লাগল। আমি কি অন্ধ হয়ে গেলাম? ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, আমাদের পাড়ার প্রসন্নকাকা সূর্যগ্রহণ দেখতে গিয়ে নাকি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন! জোড়াফটকের গেটম্যান কৈলাস অন্ধ হয়ে গিয়েছিল ফটকের ওপর রেল লাইনে একটা বাস আর 'সান্টিং' এঞ্জিনের ধাক্কা দেখে।

আমিও কি অন্ধ হয়ে গেলাম ? হঠাৎ ? কেন ? কী জন্যে ?

ভয়ে, আতঙ্কে, উদ্বেগে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি ছটফট করেছি, চিৎকার করেছি। কেঁদেছিও নিজের মনে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম—সব আমার চলে গেল। ঈশ্বরের পায়ে মাথা খুঁড়লাম। বিনতাকে অসংখ্যবার ডাকলাম। বিনতা আমি অন্ধ হয়ে গেলাম ! কী হবে আমার ? তুমি নেই। কে আমার হাত ধরে চিনিয়ে দেবে সব ?

সেসব দিনের কথা বলা যায় না, বর্ণনা করাও অসম্ভব। কেমন করে বোঝাব তখন দিন রাত্রি প্রতিটি মুহূর্ত আমার কেমন করে কেটেছে !

ডাক্তার বদ্যি এল। ওষুধ ইনজেকসান চলল। বড় বড় ডাক্তারদের কাছে নিয়ে গেল অন্ত আর বউমা। কিছু হল না। এক একজন এক একরকম অনুমান করতে লাগল। অসুখটা বলতে পারল না। গালভরা কত নাম শুনলাম। স্ট্রেচিং শব্দটা তখন প্রথম শুনলাম চোখের ব্যাপারে। কী জিনিস বুঝলাম না।

আমি ধরেই নিলাম, অন্ধ হয়ে গিয়েছি। আমার করার কিছু নেই।

গলায় আচমকা ফাঁস লেগে গেলে যেমন দমবন্ধ হয়ে আসে, ছটফট করে মানুষ, নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্যে হাতপা ছোঁড়ে—আমি সেই রকম আকুল হয়েছি, চঞ্চল হয়েছি, মাথা খুঁড়েছি, কেঁদেছি। তারপর নিজের দুর্ভাগ্য যখন আস্তে আস্তে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছি—তখন আবার এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল।

একদিন সকালে নাতির হাত ধরে এসে বারান্দায় বসে আছি। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

ফটকের কাছে শিউলি ফুলের গাছ। সকালের দিকে ঝরা ফুলের গন্ধ বড় আসে না। তবু এল....।

গন্ধটাই নাকে এল সকালের বাতাসে।

তারপর এ কী !

স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম !

আমার চোখের সামনে ওটা কী ভেসে উঠছে আস্তে আস্তে ? ঠিক গাঢ় জমাট কোনো কুয়াশা কেটে যাচ্ছে আস্তে, আস্তে, কেটে গিয়ে গাছ, ফটক, কম্পাউণ্ড, ওয়াল, লাইট পোস্ট, রাস্তা··· । একটা রিকশা গেল, বাবলা গাছের তলায় বাজার ফেরত দুটি বউ কথা বলছে।

ঘুম-জড়ানো চোখে যেমন আধো-অস্পষ্ট ভাব থাকে—সেই রকম জড়ানো ঝাপসা ভাব থেকে ছবিগুলো ধীরে ধীরে ফুটে উঠল।

তবে কি স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রমও নয় ?

আমি নিজের হাত দেখলাম, পা, জামাকাপড়, রোদ, বারান্দা। বিশ্বাস হচ্ছিল না। সত্যি কি আমি আবার আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলাম !

"দাদাভাই !"

যিশু কাছাকাছি ছিল কোথাও। ছুটে এল।

"বাবাকে ডাক। মাকে। তাড়াতাড়ি। ···তার আগে তুই আমার সামনে এসে দাঁড়া। দেখি হাত তোল। রাইট হ্যাণ্ড ! ঠিক ? পাঁচটা আঙুল। তোর গায়ে নীল রঙের গেঞ্জি। আয় কাছে আয়। এই তোর নাক, এই তোর চোখ···তোর পটাটোস··· ।"

"দাদা···"

যিশু লাফ মেরে ছুটে গেল তার বাবা মাকে ডেকে আনতে।

অন্তরা এসে পড়ল হুড়মুড় করে।

তারপর ? তারপর সে কী আনন্দ হাসিখুশি আমাদের। গলার স্বরই পালটে গেল সবাইকার।

অন্তু বলল, "স্ট্রেঞ্জ ! আমি অফিসে গিয়েই ডাক্তার ধরকে ফোন করব।"

ইন্দিরা বলল, "মাকে আমি জানিয়ে আসব আজই।"

অন্ধজন দৃষ্টি ফিরে পেলাম এ-আনন্দ কি সওয়া যায় ? আমাদের

এদিকে পাশাপাশি কাছাকাছি বাড়ি কয়েকটা মাত্র। খবরটা ছড়িয়ে গেল বিকেলের মধ্যেই। পালবাবু এলেন দেখা করতে, মিস্টার ভৌমিক এলেন। রামবিলাসবাবু এলেন। রামবিলাসবাবু কলেজে পড়াতেন। অবসর নিয়েছেন। তিনি ইংরিজিতে দু পাঁচ লাইন কবিতা শোনালেন কার যেন।

আমি ভেবেছিলাম আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল। আচমকা কোনো কারণে কিছু হয়েছিল, সেটা শুধরে গেল। মানুষের শরীর ডাক্তারদের দান নয়—যদি তুমি ঈশ্বর বিশ্বাস করো তবে তাঁর, না হয় সেই প্রকৃতির যা রহস্যময়, অকল্পনীয় এক প্রাণ-কণা যার হাতে সৃষ্টি হয়েছিল। এই জীবজগৎ, এই প্রাণীজগৎ কার খেয়ালে এত বিস্ময়কর হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু জানি—অসংখ্য বিস্ময়ের কোনো ব্যাখ্যা নেই।

কেন আমি আচমকা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, আর অন্য একদিন কেন কিভাবে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলাম তা নিয়ে ডাক্তাররাও কিছু বলতে পারল না। যা যা বলল, তা নিজেরাও বুঝল না।

আমার নিজের এক কৌতূহল থাকল অবশ্য। মাঝে মাঝে ভাবতাম কেন হল, কেন হল? যে-কৌতুহল মেটে না, যা মেটার কোনো সম্ভাবনা নেই তা নিয়ে কতকাল আর ভাবা যায়। ভাবনাটা থিতিয়ে এসেছিল। আমি সাবধানও হয়ে গিয়েছিলাম। জোর শব্দ, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, ঝড়, ধুলো, চোখ ঝলসানো আলো থেকে যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতাম। ছোট হরফের বইটইও পড়তাম না। একটানা খবরের কাগজ পড়াও বন্ধ করেছিলাম।

এত রকম সাবধানতা সত্ত্বেও আবার একদিন আচমকা ওই রকম হয়ে গেল। চোখ আমার অন্ধ হল। দৃষ্টিহারা হলাম।

দ্বিতীয়বার যখন দৃষ্টিহীন হলাম তখন মেঘ ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ কিছুই ছিল না। একেবারে শুকনো দিন। গরমকাল পড়ে আসছে। তখনও

পুরোপুরি আলো মুছে যায়নি। আকাশে একটা প্লেন যাচ্ছিল। নিচু দিয়েই। পাখির দল ফিরছিল তাদের গাছগাছালির ডালপালা পাতার আড়ালে। আমি চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্লেনটাকে দেখলাম। পাখি দেখলাম। চোখ নামাতেই দেখি একটা বাচ্চা মেয়ে সাঁতার কাটা শেষ করে সুইমিং ক্লাব থেকে ফিরছে। সাইকেলে চড়ে। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে তার ব্যাগ ঝুলছে। ব্যাগে যা থাকে সাঁতারের পোশাক, তোয়ালে—তার বেশি আর কী থাকবে। এমনিতে তার পরনে লাল ফ্রক কোট আর স্কার্ট। ঘাড় পর্যন্ত চুল।

মেয়েটিকে দেখতে দেখতে সব কেমন হয়ে গেল। রাস্তাঘাট, গাছপালা, চৈত্রের মরা আলো, সাইকেল, লাল জামা পরা মেয়েটি—কোথাও কিছু নেই আর। আমার চোখ দৃষ্টিহারা হল। আবার।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। আবার সেই ভয়। বুকের মধ্যে ভীষণ এক পশুর মতন লাফিয়ে পড়ল সেই ভয়।

আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। পাথর হয়ে। বোধ হয় একেই বজ্রাহত-টত বলে। সাইকেল রিকশা যাচ্ছিল, সাইকেল-ঘন্টির শব্দ পাচ্ছিলাম। গাড়ি চলে গেল। আমি বারবারই রাস্তার পাশ ঘেঁসে হাঁটি। তবু বুঝতে পারছিলাম না, ঠিক কীভাবে দাঁড়িয়ে আছি। গাড়ি চাপা, পড়ব কি পড়ব না।

আরও দু পা পিছিয়ে দাঁড়ালাম। ভয়ে, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম যদি দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। যদি—। এ এক অদ্ভুত প্রত্যাশা। ভাগ্যের কাছে অসহায়ের আকুল প্রার্থনার মতন।

রাস্তার কুকুরগুলো ঝগড়া শুরু করল, লরি যাবার শব্দ, একটা গাড়ি যেন ঝড় উড়িয়ে চলে গেল।

আমি যে কখন একটা হাত তুলে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। সাহায্য চাইছিলাম।

সাইকেল রিকশার ঘণ্টি বাজল। থামল কাছেই।

"কী হল দাদু ?"

"রিকশা ?" আমায় একটু ধরবে, বাবা। বাড়ি পৌঁছে দেবে ?"

রিকশাঅলা কখন নেমে এসেছে জানি না। হাত ধরার পর জানতে পারলাম।

"কী হয়েছে দাদু ? মাথা ঘুরছে ?"

"না। চোখে দেখতে পাচ্ছি না।"

"চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। ধুলোবালি পড়েছে ?"

"না।"

"আপনি দাদু রাতকানা ?"

"না।"

"আসুন। কত নম্বর বাড়ি ? কোন ব্লক ?"

বাড়ির ঠিকানা বললাম। আমি যে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম—জানতাম।

রিকশাঅলা আমাকে হাত ধরে এনে সাবধানে রিকশায় তুলল। বাড়ি পৌঁছে দিল।

ইন্দিরা বাড়িতেই ছিল। এগিয়ে এসে ধলল আমায়, "কী হল, বাবা ?"

"সেই রকম। চোখে দেখতে পাচ্ছি না।"

"সে কী! আবার! কোথায় হল ? কেমন করে ? আসুন..."

ইন্দিরা আমার হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল।

আবার হরেক রকম ডাক্তার, ওষুধ। যে যা বলল, পি সেন, ডি চ্যাটার্জি, দাশগুপ্ত, সারখেল। কলকাতা চষা হয়ে গেল।

দিন দশ পনেরো পর একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি জানালায় আলো, রোদ উঠছে, শালিখ এসে বসেছে জানালায়, কাক ডাকছে।

স্বপ্ন কি ?

শেষে বুঝলাম স্বপ্ন নয়, আবার আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে ! বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার কাছে দাঁড়ালাম। সকালটা যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে লালফুলের নাচন।

অন্তু বলল, "না, এখানে নয়। চলো মাদ্রাজ যাই। আমার অফিসের সবাই মাদ্রাজ যেতে বলছে। চোখের ব্যাপারে ওরা পয়লা নম্বর।"

"মাদ্রাজ ?"

"এখন ভাল আছ। এখনই যাওয়া দরকার।"

"কিন্তু খরচটরচ ?"

"সে-ভাবনা তোমায় কে করতে বলেছে।

মাদ্রাজও হল।

কিন্তু কই, লাভ হল কোথায় ? আমি মানুষটা অদ্ভুত এক চোখের অসুখে ভুগতে লাগলাম। এক মাস, দেড় মাস, এমন কি একটানা তিন চার মাস বেশ থাকলাম। স্বাভাবিক। চোখের কোনো গোলমাল নেই। তারপর হঠাৎ একদিন অন্ধ হয়ে গেলাম। যে কোনো সময়ে, যে কোনো ঋতুতে, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, দিন নেই দুপুর নেই রাত নেই ; না আছে ঘর, না রাস্তাঘাট, আমার চোখের দৃষ্টি চলে গেল। অন্ধ। আবার একদিন ফিরে এল, নিজের থেকেই। কবে যাবে, কবে আসবে তার কোন পূর্বলক্ষণ নেই। সবই হঠাৎ। তবে একটা জিনিস বোঝা গেল, প্রথমবার আমি সময়ের দিক থেকে একটু বেশি দৃষ্টিহীন হয়েছিলাম। সপ্তাহ তিনেক বোধ হয়। তারপর আর ঠিক অত দিন অন্ধ হয়ে থাকতে হয়নি। কখনও আট, কখনও দশ, কখনও বা দিন পনেরো পুরোপুরি অন্ধ হয়ে থেকেছি। এটাই যা ভালোর দিক। কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি যে কমে আসছে এট বুঝতে পারছিলাম। চশমাও পালটাতে হয়েছে।

আজ দেড় বছর কি তার একটু বেশি এই রকম অদ্ভুত এক চোখে

অসুখে ভুগতে ভুগতে, আর ডাক্তার দেখাতে দেখাতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, ডাক্তারদের করার কিছু নেই। চোখ, কান, নাক—এমন কি মাথার ডাক্তাররাও কিছুই ধরতে পারল না। ওষুধ আর ওষুধ বার বার এটা ওটা পরীক্ষা। অকারণ, একেবারেই অকারণ।

শেষমেশ আমি বুঝে নিলাম, ডাক্তারদের ভাষায় না হোক সাধারণভাবে যাকে টেমপোরারি ব্লাইণ্ডনেস বলা হচ্ছে, ওটা আমার ভাগ্যে রয়েছে, নিয়তি, কিছু করার নেই। সহ্য করে নিতে হবে। আর এইভাবে চলতে চলতে একদিন হয়ত আমি পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যাব, বুঝতেই পারবো না—আমি স্থায়ী অন্ধ হয়ে গিয়েছি, অপেক্ষা করে থাকব, ভাবব এই বুঝি আমার দৃষ্টি ফিরে এল ফিরে এল আবার; কিন্তু তা আর আসবে না।

মানুষের স্বভাব হল, আঘাত দুর্ভাগ্য অবধারিতকে ধীরে ধীরে মেনে নেওয়া। সহ্য করা ছাড়া তার উপায় থাকে না। আমিও আমার অন্ধত্ব—যা সাময়িক বা স্বল্পস্থায়ী—তা মেনে নিয়েছিলাম। আগের মতন আর বিচলিত হতাম না।

এই পাড়ারই এক আধবুড়ো, মহেশ মণ্ডলকে বাড়িতে এনে রেখে দিত অন্তরা। আমার যখন দেখার ক্ষমতা থাকত না—তখন সে আমায় বাড়িতে দেখাশোনা করত। সারাটা দিন। রাত্রে চলে যেত তার বাড়ি।

মহেশ আমার যত্ন করতো। আর ছায়া তো ছিলই। সাধারণ অসুবিধে তেমন কিছু হত না।

সবই প্রায় যখন স্বাভাবিকভাবে চলত, দৃষ্টিহীন অবস্থায়, তখন একটা জিনিস কিন্তু হত ভেতরে ভেতরে। প্রথমে আমি নিজেও বুঝতে পারিনি ঠিক মতন। বিশেষ করে, সেই বিশ্রী ঝড় বাদলা বজ্রপাতের দিন প্রথম যখন আমার চোখের দৃষ্টি চলে গেল, ভয়ে আতঙ্কে উদ্বেগে আমি, আমরা এমন উতলা হয়ে উঠেছিলাম যে

ভেতরে ব্যাপারটা ধরা দেয়নি। কিছু যেন বেরিয়ে আসতে চাইছিল—অথচ আসছিল না। তার ওপর ডাক্তাররা আমার উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা দেখে আমাকে শান্ত রাখার জন্যে ট্র্যাংকুলাইজার, ঘুমের ওষুধ খাওয়াত কম নয়।

তখন, ওই অবস্থায় কী যে মাথায় আসছে না-আসছে তা নিয়ে ভাবিনি, ভাবতে পারিনি। বোধ হয় খেয়ালও হয়নি তেমন করে।

দ্বিতীয় বারের পরই খেয়াল হল। প্রথম।

সেই যে, এক গোধূলি বেলায়. চৈত্রমাসে, আকাশ দিয়ে, প্লেন যাচ্ছিল—পাখিরা ফিরে আসছিল তাদের বাসায়, একটি মেয়ে সাঁতার পর্ব শেষ করে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরছিল, তার গায়ে লাল জামা পরনে সাদা স্কার্ট, ঘাড় পর্যন্ত চুল দুলছে, সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝোলানো ব্যাগে তার সাঁতারের পোশাক, সে চলে যাচ্ছিল, ঘন্টি বাজিয়ে বাজিয়ে, এলোমেলো বাতাস আসছিল চৈত্রের, আর আমি আকাশ, প্লেন, পাখি, মেয়েটিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ আবার অন্ধ হয়ে গেলুম—সেই দিন—সেই দিনটিতেই প্রথম অনুভব করলাম, বাড়ি ফেরার পর—হয়ত সন্ধের শেষে, কিংবা রাত্রে—যে, আমার দৃষ্টিহীন চোখের কোন গভীর থেকে এক অন্য জগৎ প্রকাশিত হয়ে উঠছে। আমি মনের মধ্যে তাদের দেখতে পাচ্ছি।

শুধু দেখা নয়, প্রায় নিখুঁত, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা। যেন আমার চোখের সামনেই সেগুলো ঘটছে। অথচ তা বর্তমান নয়, অতীত। এবং আমি অন্ধ।

এই যে ভেতরের জগৎ, দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে যার সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই, কেমন করে ধরা দিল আমি জানি না। এটা অনেকটা সেই রকম—বাইরে সমস্ত যখন মুছে গেল. অদৃশ্য হল, হারিয়ে গেল পুরোপুরি—তখন সে দেখা দিল ভেতর থেকে, কিংবা ফুটে উঠল ক্রমশ, ফুটতে ফুটতে পরিপূর্ণ হল। স্বপ্ন? না—স্বপ্ন নয়। আমি তো ঘুমের মধ্যে সেই জগৎকে দেখতাম না। জেগে জেগেই দেখতাম।

তবে কথাটা কাউকে বলিনি। ছেলে, ছেলের বউ, ডাক্তার কাউকেই নয়।

॥ তিন ॥

অন্তুদের বাড়ি ফিরতে দেরি হয়নি। ঝঞ্ঝাট হল বাড়িতে ঢুকতে। বারান্দার গ্রিলের তালা খুলতেই অনেক হাঙ্গামা পোহাতে হল ওদের। আমার কিছু করার ছিল না। তবু রক্ষে এই যে, বাইরের ঘরের দরজা ভেতর থেকে ভেজানো ছিল। নয়ত ওদের দরজা ভাঙতে হত। লজ্জা এবং অস্বস্তি হচ্ছিল আমার। কে জানত, বাড়িতে যখন কেউ নেই, এমন কি নাতিটাও, তখন আমার এমন অবস্থা হবে। আগে কখনও এমন হয়নি যে আমি একা বাড়িতে আছি, আর চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে গেল, একেবারে অন্ধ হলাম আমি, অক্ষম অসহায় হয়ে পড়লাম।

এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে চাবির গোছা চেয়ে এনে অন্তু গ্রিলের গেটের তালা খুলতে চেষ্টা করতে লাগল। ইন্দিরা গজগজ করছিল। ছায়া কেন চলে গেল? একদিন এক দু ঘণ্টা বেশি থাকতে তার কোথায় আটকাচ্ছিল!

পরে অবশ্য আমি ইন্দিরাকে বললাম, ছায়ার কোনো দোষ নেই। আমিই তাকে চলে যেতে বলেছি। আমি বুঝতে পারিনি এ-রকম হতে পারে!

"এই রকমই তো আপনার হয়। রাস্তায়, বাড়িতে…হঠাৎ…" যত চাপা স্বরেই বলুক, ইন্দিরার গলার তলায় বিরক্তি ছিল। থাকাই স্বাভাবিক।

"বাড়িতে আগে যখন হয়েছে তোমরা কেউ না কেউ থেকেছ! এবারই হঠাৎ—!"

"আপনাকে একা বাড়িতে রেখে আর কখনো আমরা বাইরে যেতে ভরসা পাব না। কখন কী হয়ে যায়!"

অন্তু আমার হাত ধরে ঘরে পৌঁছে দিল। "টিভিটা খোলা ছিল, তুমি টিভি দেখছিলে?"

"না রে। আমি তো নিজের ঘরেই ছিলাম। শুয়ে থেকে থেকে বড় একঘেয়ে লাগতে লাগল, যিশুটা থাকলেও বকবক করে, চুপচাপ থাকতে থাকতে উঠে গিয়ে সবে টিভিটা চালিয়েছি... বলেই আমি থেমে গেলাম, কমলার কথা বললাম না।

ও-কথা কি বলা যায়? বা এমনও বললাম না যে, নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা শুনতে শুনতে হঠাৎ এমনটা হয়ে গেল।

"তুমি আর টিভি দেখো না। হয়ত আলোটা চোখে কোনোভাবে লেগে গিয়েছে"—বলেই অন্তু একটু থেমে বলল, "না, টিভির আর দোষ কী! ওটা তো তোমার এমনিতেই হয়।...দেখি, কাল মহেশকে খবর দেব। ডাক্তার গুহকেও..."

"ডাক্তারকে খবর দেওয়া অকারণ।"

"তবু—"

"দরকার নেই। দেখি, এবার কত দিন ভোগায়!"

অন্তু কিছু বলল না।

বলার কীই বা থাকতে পারে তার! সে, আমি, আমরা—এতদিনে বুঝে নিয়েছি, এই অদ্ভুত অসুখটার না আছে কোনো নাম, না আছে কোনো চিকিৎসা। নিজের থেকেই হয় নিজের থেকেই যায়। এমন হতেও পারে যে, একদিন অসুখটা হবে—যেমন হয় হঠাৎ, কিন্তু আর সারবে না। আমি সেরে যাবার আশায় আশায় থাকব, দিন যাবে, মাস যাবে, বছর যাবে—কিন্তু আর আমার দৃষ্টি ফিরে আসবে না। তেমন দুর্ভাগ্য হতেই পারে একদিন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডাক্তাররাও এমন সন্দেহ করেছে।

অন্তু এক ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিল, এমনও তো হতে পারে

স্যার, অসুখটা আর হলই না! না-সারাটা যদি পসিবিলিটি হয়, না-হওয়াটাও পসিবিলিটির মধ্যে পড়ে! নয় কি?

ডাক্তার বলেছিলেন, "আর্গুমেণ্ট হিসেবে ঠিকই, তবে আমি বলতে পারছি না। দেখুন—যদি তেমন হয়—সে তো ভালই।" ...এই ডাক্তার ভদ্রলোকের ধারণা, আমার চোখের গোলমালের সঙ্গে মাথার একটা জট পাকানো সম্পর্ক রয়েছে।

আমার এই অন্ধত্ব নিয়ে আমি, আমার ছেলে, ছেলের বউ, নাতিটা পর্যন্ত আগে যত চঞ্চল ভীত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতাম, এখন আর তেমন হই না। ব্যাপারটা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়েছে প্রায়। এমন কি পাড়ার লোকজনও বুঝে ফেলেছে, বিশুবাবুর চোখটাই আসল। দেখা হলে চোখের খবরটাই আগে নেয়। যেমন, আজ সকালে গুহবাবু নিলেন।

আগেই বলেছি, প্রথমবার আমি ভাল বুঝতে পারিনি। বোঝার মতন মনের অবস্থাও ছিল না তখন। কিন্তু দু' একবার একই ঘটনা ঘটে যাবার পর আমি বুঝতে পারলাম, যে-মুহূর্তে আমার দৃষ্টিশক্তি চলে যায়, আমি অন্ধ হয়ে যাই—তারপর থেকে আমার মধ্যে ধীরে ধীরে কী যেন ঘটতে থাকে। কী ঘটতে থাকে তা আমি বোঝাতে পারব না, বোঝানো অসম্ভব, তবে আমার ভেতর থেকে—মনে কোন অতল থেকে কী যেন, কত কী যে ভেসে উঠতে থাকে, আমি অবাক হয়ে সেসব দেখতে থাকি। মুশকিল এই যে, আমার এই কথাটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট করে অন্যকে বোঝানোর ক্ষমতা আমার নেই। সেই যে কোথায় পড়েছিলাম—কোনো কোনো মানুষের বেলায় দেখা গিয়েছে, সাধারণ চোখের তলায় অন্য এক দৃষ্টি তাদের থাকে যা তার অন্তর্দৃষ্টি, তৃতীয় নয়ন-টয়ন তেমন কিছু একটা আমার বেলায় ঘটেছে, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। আমার কোনো তৃতীয় নয়ন নেই। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারি, যে মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে বাইরের জগৎ হারিয়ে গেল, দৃশ্যমান এই জগৎ তার পর থেকেই

দেখি—কোন্ অদৃশ্য অন্তর্লোক থেকে, অন্ধকার থেকে অন্য এক জগৎ ফুটে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে, ঠিক যেন ভোরের আলোয় দিন ফুটে ওঠা! শেষে সবই উদ্ভাসিত হয়ে ওয়ে ওঠে। আর এটা এমন নিখুঁত নিবিড়ভাবে ফুটে ওঠে যে আমি শুধু অবাক হই না, অভিভূত হয়ে পড়ি। কখনো বিস্ময়ে হতবাক, বিহ্বল, কখনো সুখে আনন্দে পরিতৃপ্ত, কখনো বা বেদনায় শোকে বিষণ্ণ। এই জগৎটিকে এমন পরিষ্কার নিখুঁতভাবে কেমন করে আমি দেখি আমিও বুঝতে পারি না। কত খুঁটিনাটি তুচ্ছাতিতুচ্ছকে আমার নজরে পড়ে যায়—কে জানে!

ওই যে সেদিন, গোধূলিবেলায়, চৈত্রমাসে, পায়চারি সেরে যখন বাড়ি ফিরছিলাম, মাথার ওপর দিয়ে একটা প্লেন চলে গেল শব্দ ছড়িয়ে, কিছু পাখিটাখি তাদের ডালপালার নীড়ে ফিরে যাচ্ছিল, লাল জামা পরা একটি মেয়ে সাঁতার কাটা শেষ করে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল—আমি তাকে দেখলাম, দেখছিলাম, দেখতে দেখতে দৃষ্টিহীন হয়ে গেলাম হঠাৎ—সেই দিনই বাড়ি ফেরার পর যাকে আমার মনে এল—তার নাম খুশি।

খুশি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বাল্যসখী। ওর ভাল নাম ছিল তুষারকণা। তুষারকণা দত্ত। আমাদের ছেলেবেলায় একরকম নামই বেশি হত। তুষারকণা, নীহারকণা, বেণু, ইন্দুমতী, সরমা, বিদ্যুৎ। আমাদের পাড়াতেই ছিল আকাশমণি, কেউ বলত আকাশি, কেউ ডাকত মণি বলে। ঠাট্টা করে আমরা বলতাম 'আকাশি'।

খুশি আমার এত ছেলেবেলার বন্ধু, যে, সে তখন ইজের, পেনিফ্রক, ফ্রক পরত, মাথার হাতখানেক চুলে ঝুঁটি বাঁধত, বকের মতন একপেয়ে হয়ে নাচতে নাচতে এক্কা দোক্কা খেলত। আমিও তখন হাফপ্যাণ্ট পরতাম, গায়ে হাফশার্ট বা গেঞ্জি কিম্বা আদুল গা। স্কুলে যাওয়ার সময় ছাড়া আমাদের পায়ে জুতোটুতো থাকত না, ধুলোতেই ভরে থাকত পা। সে যে কত ছেলেবেলা তা কেমন করে বলি! তবে

এমন ছেলেবেলা যে, ভরা বর্ষার দিন আমরা জলকাদা ঘেঁটে মাঠে মাঠে ফড়িং ধরে বেড়াতাম, কাচপোকা তুলতাম ঘুরে ঘুরে, আমাদের জ্বরজ্বালা হত যখন তখন, মা-বাবার হাতে চড়-চাপড় খেতাম রোজই।

আমাদের ছোটকি নিমিয়াবাদে বর্ষাকালটা যে ভাল ছিল তা নয়, বরং খারাপই ছিল। বর্ষা আসছে না তো আসছেই না। মাঠঘাট পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে যেত, গাছপালা শুকিয়ে কাঠ, পাতাগুলোর চেহারা হত তেজপাতার মতন, সবাই হাহা হুহু করত, মাদুরঅলা আর পাখাঅলারা সকাল থেকে মাদুর পাখা ফিরি করে বেড়াত, সন্ধেবেলায় রামভজন বেরতো কুলফি মালাইয়ের হাঁড়ি নিয়ে; আবু কোম্পানির বরফকল থেকে বরফের চালান গেলেই আমরা গাড়ির পেছন পেছন ছুটতাম দু-একটা টুকরো যদি পেয়ে যাই এই আশায়। সাতভোরে মর্নিংস্কুল শুরু হত—দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে স্কুল ভোঁভা। আমার আর খুশির ছিল—ইউ পি স্কুল। সাড়ে ন'টার মধ্যেই ঘণ্টা বেজে যেত ছুটির। গা-ময় ঘামাচি চুলকোতে চুলকোতে আমরা বাড়ির দিকে ছুটতাম।

সেই বিশ্রী, অসহ্য গরমটা কাটত একদিন। তারপর বর্ষা নামত। তার আগে মাঝে মাঝে জলঝড়, বিকেল বা সন্ধের দিকে। কালবৈশাখী। একবার খগেনকাকা হিসেব করে বলেছিলেন, একুশটা কালবৈশাখীর পর বৃষ্টি নেমেছিল ছোটকি নিমিয়াবাদে। যা নাকি কখনো হয় না। ভীষণ অলুক্ষণে ব্যাপার।...তা সেবার আমাদের ওখানে জোর কলেরা লেগেছিল। দু-তিনটে মহললায় মানুষ মরেছিল অনেক।

সেই একুশে কালবৈশাখীর পর বৃষ্টি যখন নামল তখন আমরা কী খুশি! স্বস্তির নিশ্বাস পড়তে লাগল। কিন্তু তখন কে জানত, সেবারের বর্ষা দিন মাস ঋতুর হিসেব না করে চলবে তো চলবেই। পুজো পার করে কালীপুজো কাটিয়ে তবেই বর্ষা গেল। আমরাও বাঁচলাম।

ছোটকি নিমিয়াবাদের বর্ষা অনেকটা ওই রকমই ছিল। আসছে না—আসছে না—সময় পেরিয়ে যায় প্রায়, তারপর আকাশটাকাশ ঘোর করে হুট করে একদিন নেমে গেল বর্ষা। নামল তো নামলই, আর যেতে চায় না; ঝিরঝির ঝুরঝুর ঝুপঝুপ সারাদিন জল পড়ে টুপটুপ। আমরাও তখন ইউ পি স্কুলের শেষ ক্লাসে, পড়ার বই খুলে গলা মিলিয়ে পদ্য পড়ি।

সত্যি কথা বলতে কি, বর্ষা শেষ হয়ে যাবার পর ছোটকি নিমিয়াবাদ যেন ধীরে ধীরে তার চেহারা খুলে ধরত। আকাশ বাতাস, গাছপালা, ফুল পাখি— কত কী যে চোখে পড়ত নতুন করে তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। সে এক এলাহি কাণ্ড। মিনুপিসি বলত, শীতের ডালি। তা শীতকালটা এলেই আমরা বেঁচে যেতাম। বাচ্চু বলত—পিসি সব বিউটিফায়েড হয়ে গিয়েছে। ওর মুখে ওই একটা কথা ছিল 'বিউটিফায়েড'। আমরা হেসে মরতাম। মিনুপিসিও হাসতে হাসতে কোমর নুইয়ে মাটিতে বসে পড়ত। নাকেচোখে জল গড়াত হাসির দমকে। বলত, তোদের থার্ড মাস্টার কী ইংরেজি শেখায় রে, বাবা রে বাবা। আমাদের থার্ড মাস্টারের নাম ছিল লোচন সরকার ডলবি। খেস্টান পাড়ায় থাকত। ফটাফট ইংরিজি বলত। ড্রিল থেকে শুরু করে কার্পেণ্টারি পর্যন্ত শেখাত। ছোট ছোট চুল। একটু টেরা। জেলা শহরের পুলিশরা স্যারকে হকি ম্যাচ খেলতে নিয়ে যেত বাইরে। দারুণ লোক ছিল থার্ড মাস্টার। মিনুপিসি আমাদের থার্ড মাস্টারকে নিয়ে কত ঠাট্টাই না করত! আমরা সবসময় রাগ করতাম না; মাঝে মাঝে করতাম। সবাই জানত মিনুপিসি লেখাপড়া জানা মেয়ে, ভাল ভাল কথা জানে, গান গাইতে পারে, নাটক নভেল পড়ে অর্গান বাজাতে পারে। ওদের ছোট বাংলো বাড়িতে যত রাজ্যের বেড়াল আর কুতকুতে কুকুরের ভিড়; পাখিও আছে। মিনুপিসি বেড়াল কুকুর পাখি সামলে সময় পেলেই জানলায় বসে এমব্রয়ডারি কাজ করে। মিনুপিসি দেখতে কালো ছিল, বেশ কালো;

শ্লেটের মতন রং। কিন্তু চোখমুখ, চেহারা সুন্দর। শুধু বসন্তের কয়েকটা দাগ ছিল মুখে। একটা চোখের মণিতে যেন ছাই-ছাই রং ধরেছিল। মিনুপিসির বিয়ে হয়নি। হত না। শেষে একদিন সকালের দিকে শুনলাম মিনুপিসি নেই, বিকেলের দিকে কে যেন বলল, থার্ড মাস্টারও নেই। চিত্ত বলল, 'থার্ড মাস্টার মিনুপিসিকে নিয়ে ভাগুয়া হয়ে গিয়েছে।'

মিনুপিসিদের বাড়ির কাছেই থাকত খুশি। খুশি আর আমি গলায় গলায় বন্ধু। খুশি বলল, 'মিনুপিসি পাটনা চলে গিয়েছে।'

'পাটনা কেন?'

'থার্ড মাস্টার চাকরি পেয়েছে।'

'কিসের চাকরি?'

'রেলে।'

'মিনুপিসিও চাকরি করবে?'

'গাধার মতন কথা বলিস না। বউরা কি চাকরি করে?'

অন্য সময় আমাকে গাধা বললে, খুশির মাথার এক মুঠো চুল আমি ছিঁড়ে নিতাম। সে আমায় গাধা, বোকা, ছাতু, লঙ্কা—কত কী বলে। বলেই সামনে দাঁড়িয়ে থাকে না, দু চার পা সরে যায়। জানে, চড় চাপড় খাবে। সেদিন কিন্তু সরল না, দাঁড়িয়ে থাকল। আমিও তার মাথার চুল ছিঁড়লাম না। পাড়ার যত বউ—জেঠিমা, কাকিমা, মাসিমা, পিসিমার কথা ভাবতে লাগলাম। দেখলাম, খুশি ঠিকই বলেছে—আমাদের পাড়ার কোনো বউই চাকরি করে না; সবাই উনুন ধরায়, রান্নাবান্না করে, কাপড় কাচে, গা ধোয়, চুল বাঁধে, পান খায়, তাস খেলে, গল্প করে, আর 'দেশবন্ধু' সিনেমা হলে 'সাবিত্রী সত্যবান' 'মন্ত্রশক্তি' 'কণ্ঠহার' দেখতে যায়।

খুশি ঠিকই বলেছে। বউরা চাকরি করে না। কিন্তু নানকুর বউ যে কাজ করে, বাসন মাজে আমাদের বাড়িতে! তিলুয়ার বউও চার বাড়িতে কাজ করে! আমাদের ধোপার বউ—কী সুন্দর দেখতে, গাঁটরি

মাথায় করে কাপড় নিতে আসে। তা হলে ?

খুশি বলল, 'ওরা কি আমাদের জাত ?'

'ও !'

'তুই কিছুই বুঝিস না। তুই একটা ডাব।'

'স্কুলে যে পড়ায়—' চড়াৎ করে আমার মাথায় রমামাসি এসে গেল।

'মেয়েদের লোয়ার প্রাইমারিতে ? পুতুলদিদি, রমামাসি···'

'হ্যাঁ।'

'সে তো পুচকে মেয়েদের স্কুলে। অ আ অজ আম-র স্কুল। ওরা মাস্টারনী।···আমি বড় হয়ে বড় স্কুলে মাস্টারনী হব !'

খুশি মাস্টারনী হবে ! অক্ষর 'অ' জানে না, ভুগোল জানে না, ইতিহাসে পাঁচ পায় ! আমি তো হেসেই মরি।'

'হাসছিস ?'

'তুই বউ হবি না ?'

'বউ ! কার ?'

'যার তার—!'

'তোর মতন বাঁদরের—' বলে আমাকে আধখানা জিব বার করে ভেংচে খুশি ছুট মারল।

ও আমায় বাঁদর বলল। বলুক। আমি শুধুই হেসে মরছিলাম।

সন্ধেবেলায় বারান্দায় লণ্ঠন জ্বালিয়ে পড়তে বসে আমার বাবার থার্ড মাস্টার ও মিনুপিসির কথা মনে পড়ছিল। মিনু পিসি বৌ হয়ে গেল থার্ড মাস্টারের ! রান্নাবান্না করবে, গা ধোবে, চুল বাঁধবে, পান খাবে, তাস খেলবে ? কী হবে তার বেড়াল কুকুরের পাখির ? মিনুপিসি আর গান গাইবে না, 'সাঁঝের তারকা আমি পথ হারায়ে এসেছি ভুলে—' নাটক নভেল পড়বে না ?

বিয়ে তো আমাদের পাড়াতেও হয়। বোলদির হল, রাধাদির হল। কিন্তু সে অন্যরকম। আমরা নেমন্তন্ন খেয়েছি।

থার্ড মাস্টার আর মিনুপিসির বিয়েটা একেবারে উলটো হল।

আমার নিজের মা নেই। ছোট মা আর বাবার কথা একসময় কানে এল। তখন সন্ধেরাত ফুরিয়ে গিয়েছে। ঘরের মধ্যে মা-বাবা কথা বলছিল।

বাবা ছোট মাকে বলছিল, 'বামুনের মেয়ে, একটা খেস্টান ছেলের সঙ্গে পালাল। ব্যানার্জিসাহেব নাকি বাড়ি ছেড়ে বেরুতে পারছেন না।'

ছোটমা বলল, 'বামুন কায়েতে কি যাচ্ছে আসছে। ধাড়ি মেয়ে। তার নিজের ইচ্ছেটিচ্ছে নেই! ভালই হয়েছে। ওই মেয়েকে তোমাদের কেউ বিয়ে করত! চেষ্টা তো কম হয়নি। কে রাজি হল বলো! মেয়ে কালো, মুখে দাগ, বয়েস হয়েছে—কত কথা! আর তোমরা বাপ কানা খোঁড়া ঘুঁটেপোড়া হলেও ছেলে—তোমাদের বিয়েতে আটকায় না।'

'তুমি আমায় বলছ?'

.তোমায় বলব কেন? ছেলেজাতের কথা বলছি—'

'আমি ভাবলাম, আমায় বলছ!···তুমি দ্বিতীয় পক্ষ তো— !

'ঢং করো না। বিয়ের আগে যখন কৃষ্ণপক্ষ না শুক্লপক্ষ ভাবনি, বিয়ের পর আর পক্ষ ভাবতে হবে না।'

ছোট মায়ের কথায় রাগ আর খোঁচা ছিল। আমার বাবার উদ্দেশে নয় হয়ত। কেন না আমার বাবাকে ছোটমায়ের বাড়ি থেকেই হাতে পায়ে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া আমার ছোটমা মানুষটি বড় ভাল। চার পাঁচ বছর বয়েস থেকে মানুষ করেছে আমায়। তার নিজের কোল খালিই থেকে গেল।

পরের দিন খুশিকে বললাম, থার্ড মাস্টার বিউটিফায়েড হয়ে গিয়েছে।

খুশি বুঝল না। বলল, 'কেন?'

'বিয়ের পর বিউটিফায়েড হবে না!'

খুশি তেঁতুলের আচার আঙুলে করে জিভে লাগাচ্ছিল, চাটছিল,

আর জিভ বার করে আমায় দেখছিল। টেরিয়ে টেরিয়ে।

আমি জানি খুশির মাথায় কিছু নেই। পুষ্করিণী বানান জানে না, ইংরিজিতে ফ্রগ্ বানান লিখতে গেলে তিনবার পেনসিলের শিস ভাঙে, সূর্য পৃথিবী থেকে কত দূর তা জানে না। আর অঙ্কর নাম শুনলে ওর পেট কামড়ায়। বিয়ের পর মিনুপিসি কেন বিউটিফায়েড হবে—এটা বোঝাবার জন্যে ওকে বললাম, 'মিনুপিসি রান্নাঘরে রান্না করবে, ভাল ভাল সাবান মেখে চান করবে, ডুরে ডুরে শাড়ি পরবে, বড় খোঁপা করে চুল বাঁধবে...'

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে খুশি নাকমুখ সিঁটকে বলল, 'থাম। তুই কচু জানিস। মিনুপিসি রান্না করতে জানে না, তরকারি কাটতে পারে না। আঙুল কেটে হাত পুড়িয়ে বসে থাকবে। আর ডুরে শাড়ি পরবে কোথ্ থেকে? কে দেবে? থার্ড মাস্টার তো কেবিনম্যানের চাকরি পেয়েছে। কত টাকা মাইনে পাবে রে?'

খুশির যে এত খবর জানা হয়ে গেছে আমি জানতাম না। 'তোকে কে বলেছে?'

'জানি।'

'তুই একেবারে ভগবান!'

'হ্যাঁ, ভগবান।....তুই হনুমান, আমি ভগবান।'

সঙ্গে সঙ্গে দু চারটে চড়-চাপড়, মাথার চুল ছেঁড়া হয়ে গেল। ও আমার নাকচোখ খিমচে দিল। কামড়ে দিল। আমি ওকে ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দিলাম।

তারপর আড়ি।

এমন আড়ি, ভাব; ভাব আড়ি আমাদের হরদম হত।

হতে হতে আমরা বড় হচ্ছিলাম। খুশি মাথায় লম্বা হচ্ছিল, টিঙটিঙে হচ্ছিল, ঢেঙি, কানে মাকড়ি পরতে শুরু করল।

আমিও বড় হচ্ছিলাম।

শেষে বাবা আমাকে বাইরে পাঠিয়ে দিল। হোস্টেলে। ছোট মা

প্রথমটায় রাজি হয়নি। বাবা ছোট মাকে বুঝিয়ে বলল, 'এখানকার হাইস্কুল ভাল না। পঁচিশটা ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলে চার পাঁচটা পাস করে। তিনটে আবার থার্ড ডিভিসনে। বিশুকে এখানে রাখলে লেখাপড়া হবে না। গোল্লায় যাবে। শেষে মুদির দোকান করতে হবে, না হয় রেল খালাসির চাকরি। তোমার আঁচল চাপা হয়ে থাকলে ওর চলবে না। ওকে লেখাপড়া শিখতে হবে। মানুষটানুষ হতে হবে। আমার বন্ধু হরিদাসকে লিখেছি। সে কড়া হেড্মাস্টার। যোগবাণী স্কুলটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ছোটমা আর আপত্তি করল না। আমি বাইরে পড়তে যাব বলে, বাক্স বিছানা গোছাতে লাগল, নতুন জামা প্যান্ট গেঞ্জি জুতো আসতে লাগল আমার জন্যে। মায় রুমাল। ছোট মা সুতো দিয়ে আমার রুমালে নাম লিখে দিল।

আমার তো খুশি-খুশি লাগছিল। তবে রাত্রে খুব মন খারাপ হয়ে যেত। আমাদের পাড়াটার নাম ছিল শিমুলবাগান। অনেক শিমূল-গাছ ছিল একসময়ে। এখনও পোয়া মাইল হাঁটলে শিমূলবন। এত গাছ কি নতুন জায়গায় পাব? তারপর শীতের সময় পাখিতে পাখিতে ভরে যেত মানবাবুর বিশাল বাগান। কত রকম পাখি। যেন কাঁচা হলুদে ভেজানো এক একটা একহাতি টিয়াপাখিও আসত, আসত তিতির, ডমরু, আরও কত কী! অত নাম কে জানে!

আমার যাবার আগে বন্ধুরা মিলে একদিন গোশালার দিকে বেড়াতে গেলাম। একদিন গেলাম চাঁদমারি। পটলার বাড়িতে একদিন ডিম ভেজে পরোটা বানিয়ে ফিস্টি করা গেল।

শেষে যাবার দিন এসে গেল। তখন শীতকাল। হুহু হাওয়া বইছে শীতের, কনকনে ঠাণ্ডা, রাত্রে মালসার আগুনে হাত পা সেঁকতে হয়।

আকাশমণি, মানে আকাশি, আমাকে দুটো ভাল পেনসিল, একটা ইরেজার আর ছোট্ট একটা সুসমাচার দিল। উপহার।

খুশিকে পেনসিল ইরেজার দেখাতেই সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'চোট্টাই জিনিস তুই নিলি ?'

'চোট্টাই ?'

'আকাশির বাবা অফিস থেকে পেনসিল, নিব, কাগজ, রবার চুরি করে আনে। পয়সা দিয়ে তা কিনতে হয়নি, তাই তোকে দিল।'

'দিল যখন—'

'নিয়ে যা তাহলে।....আমি হলে নিতুম না।'

দুপুরে এইসব কথা হল। সন্ধেবেলায় দেখি খুশি আমাদের বাড়ি এসে চুপিচুপি আমায় একটা শ্বেতপাথরের ছোট্ট মূর্তি দিচ্ছে। দেবীর মূর্তি। কার মূর্তি বোঝা যায় না।

'এটা কী রে ?'

'রেখে দিস। বাক্সে। তোর অসুখবিসুখ হবে না।'

'কে দিল তোকে ?'

'চুরি করে এনেছি। মায়ের জিনিস। মায়ের কাছে অনেকগুলো আছে।'

'তুইও তো চুরি করলি ?'

'মায়ের জিনিস নিলে চুরি হয় না। মাকে চুরি করেই আমরা আসি।'

'আমি অবাক হয়ে গেলাম। খুশিকে কে এমন কথা শেখাল! নিজের মায়ের জন্যে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মাকে আর মনে পড়ল না।

রাত্রে ছোটমা আমাকে বলল, 'বিশু, তোর কি খুব মন কেমন করছে ? বোকা ছেলে, মন খারাপ করিস না। ছুটিতে ছুটিতে বাড়ি আসবি। তুই লেখাপড়া শিখে ভাল হবি, বড় হবি—আমাদের দেখবি। তোর ভালোর জন্যেই সব।'

আমি কেঁদে ফেললাম। ছোটমা আমাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে নিজেও কাঁদতে লাগল।

অঙ্ক জিনিসটা আমি ভালই শিখতে পারতাম। মনও ছিল তখন। সের পরীক্ষাতে আশি পঁচাশির কম পেতাম না। সেকেণ্ড মাস্টার মায় ঠাট্টা করে বলতেন, যাদব চক্রবর্তী।

দেখলাম জীবনের অঙ্ক অন্যরকম। তা মেলানো যায় না। প্রশ্ন র উত্তর অন্যরকম হয়ে যায়।

মাত্র তিন বছরের মধ্যে কত কী ঘটে গেল। আমি দিব্য কিশোর য় গেলাম। ছোটমায়ের কোলে আমার এক বোন এল। ফুটফুটে। বার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল ঝড়ের দিন গাছের ডাল ভেঙে গায়ে ড়।

আর খুশিও বড় হয়ে গেল। কিশোরী।

মাথায় লম্বা, গায়ে শ্যামলা, হাতপায়ে মাংস ধরে গিয়েছিল নিক। তার মাথার চুল বড় হল। ও বরাবরই দৌড়ঝাঁপ করা পার্টসে প্রাইজ পাওয়া মেয়ে। খুশি সাইকেল চড়তে শুরু করে য়েছিল। তার ফ্রকের ঝুল হাঁটুর তলায় নামল। চোখ যেন আরও লো হয়ে এল। ওর কোমর-বুক ফুটে উঠল।

আমিও তখন লায়েক হয়ে উঠছি। মালকোঁচা মেরে কেত্তা দিয়ে পাড় পরি, শার্টের কলার তোলা থাকে। গলার স্বর মোটা হতে শুরু ছে। পায়ে কাবলি চটি। লুকিয়ে এক আধ টিপ নস্যি নাকে জি। বন্ধুদের সঙ্গে দু একদিন ভাগাভাগি করে 'পাসিং শো' ারেট পরখ করেছি।

আমি চড়চড় করে লম্বা হয়ে যাচ্ছিলাম। ফলে আমাকে ারোগা দেখাত। চোখের কোল একটু বসে যাচ্ছিল তখন।

ছুটিতে বাড়ি আসার সুখ তখন থেকেই কমতে শুরু করেছিল। ার এক চোখ নষ্ট। চাকরিতে আর উন্নতি হচ্ছে না। পেছনে গছে বড়বাবুরা, ঝগড়াঝাটিও করত বাবা। শরীরও ভেঙে যাচ্ছিল ার।

ওদিকে ছোটমা তার কোলের মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত। আমায় যে অনাদর করত তা নয়, তবে ছোটমায়ের সেই ভালবাসায় ভাঁটা লেগেছিল। তবে, একথা আমি বলব, ছোটমা তখন যে বলত, তুই কি আর খোকা আছিস, বুড়ো খোকা হয়ে গিয়েছিস, তোর গোঁফ উঠতে শুরু করল, এখন তোকে মারতে ধরতেও পারি না, আঁচলের তলায় আগলে রাখতেও পারি না, বুঝলি !—এটা ঠিকই। তবু, আমি বুঝতে পারতাম, আমার ওপর ছোটমায়ের টান কমে আসছে।

আমার বাবা তখন মদ খেতে শুরু করেছিল। কোথায় গিয়ে খেত তা আমি জানি না। খাবার জায়গার অভাব কী ! তাছাড়া আমি তো মা-বাবার কাছে থাকতাম না বরাবর।

সেবার গরমের ছুটিতে বাড়ি এসেছি। এসে দেখলাম, বাবার মেজাজ অনেক তিরিক্ষে হয়ে গিয়েছে। ছোটমায়ের মুখ হয়েছে আলগা, জিভ ধারালো। মা-বাবায় ঝগড়া লেগে যায় কথায় কথায়।

ভাল লাগছিল না।

সেই দিনটার কথা বলি। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে সব বিকেলের দিকে আমি সরবত খাব বলে বাজারে যমুনাদের দোকানে দিকে যাচ্ছিলাম, খুশির সঙ্গে দেখা। সাইকেল চালিয়ে আসছি পনপন করে। গায়ে লাল ফ্রক। পাতলা কাপড়ের।

আমায় দেখে খুশি সাইকেল থামাল। 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

'বাজারে। সরবত খেতে।'

খুশির কপাল দিয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। গালগলা ভিজে। হা দুটোও যেন জলজলে। ঘামে নেয়ে গিয়েছে।

খুশি বলল, 'বাজারে কেন যাচ্ছিস। বরফকলের কাছে ছোট্টু সরবতের দোকান করেছে। সরবত, লেমনেড, জিনজার...। দিয়ে লেবু দিয়ে সিরাপ দিয়ে সরবত তৈরি করে। কী সুন্দর খেতে যাবি ?'

'কত পয়সা নেবে ?'

'বড় গেলাস ছ পয়সা। ছোট গেলাস চার পয়সা। তুই পয়সার কথা ভাবিস না। আমি তোকে খাওয়াব।'

'বাব্বা! তুই বড়লোক হয়েছিস?'

'আয়। আগে বাড়ি যাব। দু মিনিট। তারপর···'

'তুই সাইকেলে এগিয়ে যা আমি আসছি···'

খুশি 'আয়' বলে চলে গেল।

আমি আর বাজারের দিকে গেলাম না। খুশিদের বাড়ির দিকেই এগিয়ে চললাম।

বকুলগাছের তলায় খুশি সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের একটা পুঁটলি ঝুলছে। গামছায় বাঁধা।

'ওটা কী রে?'

'জামাটামা!'

আমি ঠিক বুঝলাম না।

খুশি বলল, 'বরফকলের পাশের পুকুরে একটু সাঁতার কাটব। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে সরবত খাব। কেমন? কী গরম বল?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তুই, সাঁতার কাটতে শিখেছিস?'

'বাঃ! কবেই।—তুই শিখিস নি?'

'না।' মনে হল খুশি তার নতুন শেখা বিদ্যেটা আমাকে দেখাতে চায়।

'ভয়ে?' খুশি হেসে উঠল। তারপর বলল, 'নে, তুই সাইকেল চালা আমি কেরিয়ারে বসব।'

খুশির সাইকেল মেয়েদের। তবু পেছনে কেরিয়ার লাগানো আছে।

আমি সাইকেল টেনে নিয়ে দুপা এগুতেই খুশি কেরিয়ারে চেপে বসল। বসেই বকবক শুরু করে দিল। সে সোজা সাঁতার, চিৎ সাঁতার, ডুব সাঁতার সবই শিখেছে।

বরফ কলের কাছে একটা পুকুর বরাবরই ছিল। লোকে বলত, প্রহ্লাদবাবুর পুকুর। বাবুর মস্ত বাগানও ছিল পাঁচিল ঘেরা। পুকুরটায় ওদিকের কেউ কেউ স্নান করত। একপাশে কাপড় কাচত ধোপারা। সাঁতার কাটতে কমই দেখেছি।

'তুই সাঁতার কাটিস রোজ ?' আমি বললাম।

'রোজ নয়। কাটি। এখন জল কম। বর্ষাকালে অনেকেই কাটে পাড়ার ছেলেমেয়েরা।'

'তুই একলা একলা যাচ্ছিস ! যদি ডুবে যাস ?'

'ধ্যাৎ, ডুবব কেন !…আমার ভীষণ গরম লাগছে, আজ। আর তুই যখন সরবত খেতে যাচ্ছিস—তখন একটু কেটেনি সাঁতার।'

'বাড়িতে জানে ?

'জানে।'

আমরা পুকুরের কাছে পৌঁছলাম।

সাইকেলটা একপাশে রেখে দিতেই খুশি বলল, 'আমি পুঁটলি নিয়ে চললাম। তুই বসে থাক।'

পুঁটলি রেখে খুশি পুকুরের জলে ঝাঁপ দিল।

তখনও কত বেলা। রোদ যেন আর যেতে চায় না। আলো রয়েছে, প্রহ্লাদবাবুর বাগানের আম কাঁঠাল গাছে হাওয়া লেগেছে, কোকিল ডাকছিল তখনও, মাঠের পর মাঠ খাঁখাঁ। কাঁটাগাছের ঝোপের পাশে একজোড়া মোষ চরছে তখনও। আকাশ জুড়ে রং ধরতে শুরু করল।

খুশি সাঁতার কাটছে, তার লাল ভিজে জামা মাঝেমাঝে ফুলে উঠছে, চুপসে যাচ্ছে, খুশি এক একবার হাত তুলে আমাকে তার সাঁতার কাটার খেলা দেখাচ্ছে।

ওর সাঁতার কাটা শেষ হল। পুকুরের এদিকে একজোড়া কলকে ফুলের গাছ নুয়ে আছে, পাশেই আকন্দ ঝোপ।

খুশি ওখানেই তাঁর পুটলি রেখে গিয়েছিল।

সাঁতার শেষ করে উঠে এসে খুশি পুঁটলি খুলতে খুলতে খানিকটা তফাত থেকেই বলল, 'তুই উঠে যা !'

'কেন ?'

'জামা ছাড়ব !'

'ছাড় !'

'অসভ্য, বাঁদর··· !'

আমি উঠে যাচ্ছিলাম ; সবেই উঠে দাঁড়িয়েছি. দেখি আমার পায়ের হাত দুই তফাতে একটা সাপ। সর সর করে এগিয়ে আসছে।

ভয়ে সাপ বলে চিৎকার করে দু পাঁচ লাফ মেরে পিছিয়ে আসতেই খুশি তার পুঁটলি নিয়ে দৌড়ে আমার দিকে চলে এল। এসে সে কলকে আর আকন্দ ফুলের ঝোপের দিকে তাকাচ্ছিল।

আমি সাপটাকে দেখছিলাম। সরসর করে, এঁকেবেঁকে লিকলিকে সাপটা ঘাসপাতার আগাছার কোন আড়ালে চলে গেল।

'কোথায় সাপ ?' খুশি বলল। তার গলায় ভয়।

'ওখানে ছিল। লুকিয়ে গেল—'আমি আঙুল দিয়ে সাপের জায়গাটা দেখালাম।

খুশি একবার জায়গাটা দেখল। তারপর আমার দিকে তাকাল। আমিও তাকে দেখলাম। ভেজা চুল, ভেজা জামা, জল গড়িয়ে পড়েছে সর্বাঙ্গ থেকে।

হঠাৎ কী হল কে জানে, আমি কিছু বোঝবার আগেই খুশি তার হাতের পুঁটলিটা দিয়ে আমার মুখে মারল। এত জোরে, এমন আচমকা সে মেরেছিল যে আমি চোখের পাতাও বুঝি বুজতে পারিনি। চোখে এসে লাগল।

'উঃ—!' বলে চোখে হাত দিলাম। তারপর আর চোখ খুলতে পারলাম না।

খুশি আমায় যা তা গালমন্দ করতে করতে কোথায় চলে গেল।

বাড়ি ফিরতেই ছোটমা বলল, 'ও কী ! কী হয়েছে তোর চোখে ?

রক্ত জমে গিয়েছে যে!'

.আমি বললাম, 'ধুলো কাঁকর পড়েছিল। রগড়ে ফেলেছি।'

রক্ত-জমা চোখ নিয়ে আট দশ দিন ভুগলাম। খুশি একদিনও আর এল না।

তার পরও পাড়ায় খুশিকে আমি দেখেছি। সে আমায় দেখেছে। ও আমাকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নিত। আমিও ওকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতাম। শেষে একদিন দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে গেল। আমি নিজের স্কুল হোস্টেলে ফিরে গেলাম।

পুজোর পর আমার বাবা মারা গেল। ছোটকি নিমিয়াবাদ থেকে আমরাও চলে এলাম একদিন।

॥ চার ॥

খুশির সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে ভাবিনি।

বেশ কয়েক বছর বাদে আমি যখন চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ছোটমা তার বাপের বাড়িতে এক জোড়া ভাই ভাজের দাসী, তার মেয়ে—আমার সৎ বোন টাইফয়েডে মারা গিয়েছে, আমি যাযাবর, আজ এখানে কাল ওখানে, কখনো কোনো দোকানে চাকরি করি, খাতা লিখি, হজম, অর্শ, দাদ-এর ওষুধ ফেরি করে বেড়াই, বাচ্চা-কাচ্চা পড়াই আরও কত কী—তখন একবার জামালপুর গিয়েছিলাম এক চাকরির পরীক্ষা দিতে। সেখানে যাদের বাড়িতে দু-রাত্রি ছিলাম সেই বাড়িতে খুশির সঙ্গে দেখা। ও-পাড়াতেই থাকত খুশি।

খুশি তখন বাড়ির বউ, চেহারা পালটেছে, ভোঁতা ভসকা দেখায়, মিলের ছাপা শাড়ি পরনে, হাতে গলায় গয়না, নাকে নাকছাবি। ওর নাকি দুটো ছেলেও হয়ে গেছে ওরই মধ্যে। একটা সদ্যই কোলে

এসেছে।

নিজের থেকেই খুশি আমার সঙ্গে দেখা করতে এল, কথা বলল, খোঁজখবর নিল।

আমি এক সময় হেসে বললাম, 'তোমার তাহলে মাস্টারনী হওয়া হল না?'

খুশি মাথা নাড়ল। হাসল। 'ছেলেবেলার কথা আর গাছের পাতা একই জিনিস।'

'নাকি?'

'ও ঝরে যায়। নিজের থেকেই।'

'তুমি তো মুট্টি হয়ে গেছ!'

'শরীরে জল। রক্ত আর কই! প্রথমে পা ফুলছিল। ডাক্তার বলল, বেরিবেরি। তারপর মুখ ফুলল। এখন ডাক্তার বলছে, গায়ে জল জমছে, রক্ত কমছে। আজ ভাল থাকি তো কাল জ্বর হয়. মাথা ঘোরে। দুটো কচি। সামলাতে পারি না। কে জানে বাঁচব কিনা!

'আরে দূর! বাঁচবে না আবার কী? নিশ্চয় বাঁচবে।'

'আমার চোখ, হাতের আঙুল সাদা হয়ে গেছে। ঠোঁট সাদা। যখন তখন পান খাই। সাদা ঠোঁট দেখলে আমার ভীষণ ভয় হয়।' বলে খুশি হঠাৎ তার চোখের নিচের দিকে পাতা উলটে, হাত বাড়িয়ে তার রক্তহীনতা দেখাতে লাগল, 'সূতিকা। মরণ রোগ। দেখতে দেখতে সব শুষে নেবে। ঝেঁটার কাঠি হয়ে যাব।' শেষে বলল. 'তোমার চোখ ঠিক আছে তো?'

'চোখ! চোখের কী হবে! ঠিক আছে। বলে আমি হাসলাম। কোন ছেলেবেলায় কবে রক্ত জমেছিল—তা কি আর এতদিন থাকে!'

খুশি বলল, 'তুমি একেবারে হাড়গিলে হয়ে গিয়েছ!'

'কী করব! খেতে পাই না, চানামটর চিবিয়ে কতদিন চলে।' বলে আমি হাসলাম জোরে জোরে।

খুশি আর বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। চলে গেল। যাবার আগে কেমন অদ্ভুত বিষণ্ন চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল ক'পলক।

সত্যিই তখন আমার চানা-মটরের দিন। একটা চাকরি পাই না। এলেবেলে কাজ করে দিন গুজরানো। শেষে যুদ্ধের বাজারে একটা চাকরি পাওয়া গেল কেরানির। এম ই এস অফিসে। মেসে থাকি, সম্পত্তি বলতে তক্তপোশ, মশারি আর ট্রাংক একটা। ছোটমাকে কাছে এনে রাখার উপায় নেই। মাঝে মাঝে দশ পনেরো টাকা পাঠাই মাকে।

ছোটমাও মারা গেল একদিন। ওদের বাড়িতে বলল, যক্ষ্মায়। আসলে শোক দুঃখ পরিশ্রম আর অনাদর অবহেলায়। অপুষ্টিতে।

ওইখানে একটা গিঁট যেন ছিল, যত আলগাই হোক। সেটা খুলে গেল। আমি নিশ্চিন্ত। আর তো কেউ থাকল না। পিছুটানের পালা শেষ।

যুদ্ধ ফুরোলো। চাকরির পাটও শেষ হল একদিন। গুপ্তা বলে আমার এক বন্ধু জুটেছিল। রপ্ত ছেলে। তার পাল্লায় পড়ে চলে গেলাম গয়া। সেখানে এক জুতোর দোকান খুলল গুপ্তা। আমি তার পার্টনার।

গুপ্তা ছিল ওস্তাদ ছেলে। সব ব্যাপারেই তার টনটনে জ্ঞান। আমাকে বলত, 'তুমি সেরেফ দোকান দেখবে। আমি সাপ্লাই আনব। আরে শালা, এরা তো পরে কেডস্ জুতো, বড় জোর চপ্পল। আমার জানাচেনা আছে। মাল আমি নিয়ে আসব। স্ট্যাম্পু মারা থাকবে। ভেব না।'

জুতোর দোকানে হাঁ করে বসে থাকার ক্লান্তি কাটাতে গুপ্তর সঙ্গে আমি নেশাটেশা শুরু করলাম। গুপ্তা একটা ঘোড়া টাইপের মেয়ে জুটিয়েছিল। যেমন মদ্দা মদ্দা দেখতে তেমনি তার পা ছোঁড়া। নাম ছিল, জিনজি। বাঙালি নয়। সে বিড়ি খেত, পান খেত, মদ খেত। আর বেশি মদ খাওয়া হয়ে গেলে অসন বসন খুলে নাচত। গলা

জড়িয়ে এমন করে চুমু খেত আমাদের যে গাল ভিজে যেত। জিনজির বয়েসও কম হয়নি। আমাদের সমান সমান হবে। তার একটা মাত্র গুণ ছিল, মায়ামমতা দেখাতে কসুর করত না। চটির সঙ্গে চাপাটিও দিত খেতে। পান-জরদা খাওয়া কালো দাঁতে হেসে হেসে আমাকে বলত, 'লে বিশুয়া, চাপাটি খা লে! হালুয়া খা।'

আমার ভাল লাগছিল না। জুতোর দোকানে বসে বসে কাঁহাতক জুতো বিক্রি করা যায়। শেষ পর্যন্ত জিনজিকে বললাম, আমি চলে যাব— গুপ্তাকে তুমি সামলিয়ো।

জিনিজ বলল, তু ভাগ্ যা শালে! বলে আমায় বোঝাল যে গুপ্তাকে সে সামাল দিয়ে নিতে পারবে। তুই ভদ্দরলোকের ছেলে,ও হারামি রাণ্ডিখোর, তোর এখানে থাকার দরকার কী! ভাগ যা।'

গুপ্তকে কিছু না বলেই আমি পালিয়ে এলাম।

পালিয়ে এসে উঠলাম রানীগঞ্জ।

এমনিতে কোনো কারণ ছিল না রানীগঞ্জে ওঠার। ট্রেনে আসার সময় এক পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কুশারীবাবু, তাঁর বউ, আর মেয়ে। ফিরছেন কাশী থেকে। বেড়াতে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক, সকলকে নিয়ে তীর্থটাও সেরে এলেন। ভাঙ্ আর রাবড়ির গল্প করতে করতেই অর্ধেক পথ কাবার।

কুশারীবাবুর কপাল মন্দ। ট্রেনে তাঁর বমি শুরু হল। ভেদবমি। এক রাত্রেই যায় যায় অবস্থা। তাঁর স্ত্রী মেয়ে অসহায় হয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমার হাতে পায়ে ধরেন মহিলা। স্বামীকে নিজের জায়গায় পৌঁছে দিন।

কোনোরকমে রাণীগঞ্জে পৌঁছোনো গেল।

কুশারীবাবু বার্ন কম্পানিতে চাকরি করতেন। থাকতেন বাজারের দিকে। পৈতৃক বাড়ি। কুশারীবাবুর বাপ ঠাকুরদার নাকি কবিরাজি পেশা ছিল।

রাখে হরি তো মারে কে ? মারে হরি তো রাখে কে ;
কুশারীবাবুকে হরি রেখে দিলেন।
আমারও জায়গা হল কুশারীবাবুর বাড়িতে।
বাড়িটা এতই পুরনো যে তার ভিতে বুঝি ফাটল ধ
ঘুন। তবে হ্যাঁ—যতই অন্ধকার, ঠাণ্ডা, চুন-বালি খসা, হ
না কেন সে-বাড়ি—তার দোতলাতেই খান চারেক ঘর ছিল
সেই রকম। অত বড় বাড়িতে থাকার অভাব ছিল না। তা
তারও অভাব নেই। কুশারীবাবুর কিছু জমি-জায়গা ছা
ছিল, চাকরিতে এখান ওখান থেকে বাড়তি আয়ও ছিল।
কুশারীবাবুর তদ্বিরে আমি একটা কাজ পেলাম। মা
বউদির—কুশারীবাবুর স্ত্রীকে আমি বউদি বলতাম—
চিন্তামণি। বিল্বমঙ্গল প্লে-তে এক চিন্তামণি দেখেছি।
চিন্তামণি। আকাশপাতাল ফারাক। প্লের 'চিন্তামণি'
গোলগাল, সরা-মালসার মতন ছাঁদ ছিল মুখের। আর এ
ছিপছিপে, টকটকে রং গায়ের, চোখের পাতা ভুরু থে
গড়িয়ে হাসি পড়ত যেন। আমি হেসে হেসে বলতাম, 'বউ
নাম চিন্তামণি হল কেন ? এত নাম থাকতে চিন্তামণি ?'
বউদি বলতেন, 'কী জানি ভাই, নাম আমার মা-বা
আমায় জিজ্ঞেস করে তো রাখেনি।'
'আপনি বিল্বমঙ্গল প্লে দেখেছেন ?···ওরে মন কেম
নয়ন ”
'বায়োস্কোপ দেখেছি। সাপটার কথা মনে আছে আমা
করে না ?'
'আমি প্লে দেখেছি। আমাদের ছেলেবেলায় বড়রা
থিয়েটার আনত। বলে অন্য কথা তুলতাম। হয়ত নি
বেলার গল্প করতাম। বা বউদির দেশবাড়ির গল্প শুনতাম।
একবার বউদি আমায় বললেন, 'তোমার দাদাকে

বলেছি।'

'কেন?'

'বলব না! নিজেরটি যেমন বোঝে পরেরটি বোঝে না কেন? বললাম, তুমি বলো অফিসে তোমার কথা কেউ ফেলে না, খাতিরের মানুষ তুমি। তা বিশুঠাকুরপোকে ওটা কী এক চাকরি জুটিয়ে দিলে? ক'টা টাকা মাইনে পায়! একটা ভাল চাকরি করে দিতে পারলে না?'

আমি হেসে বললাম, 'বউদি, ছাগল ছাগলই, তাকে দিয়ে লাঙল টানানো যায় না। আমার যা বিদ্যে তাতে ওই কালি টানার কাজই যথেষ্ট। আপনি দাদাকে অযথা খেপিয়ে দিলেন।'

বউদি বললেন, 'না গো না! চার দিক ভেবে দেখতে হবে না। তোমার বয়েস হয়ে গেল। আজ বাদে কাল নিজের ঘরসংসার পাতবে, বিয়ে করবে। এই চাকরি করে চলে নাকি?'

বউদির মেয়ের বয়েস চোদ্দ পনেরো। সুমতি তার নাম। সুমু সুমু বলে ডাকে সবাই। বউদি নিশ্চয় সুমুর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ভাবছেন না যে হবু জামাইয়ের জন্যে তাঁর চিন্তা হবে। তা ছাড়া সুমুকে আমি তুই তোকারি করি। তার প্রায় ডবল বয়েস আমার। আমি ওঁদের সগোত্রও নই।

বউদির স্নেহ অকৃত্রিম। স্বার্থের কোনো গন্ধ নেই। ভাল চাকরির কথা শুনতেও ভাল লাগে।

ঈশ্বর জানেন, আমি দিনে দিনে বউদিকে বড় আপন ভেবে নিয়েছিলাম। বউদি যে একেবারে দেবী ছিলেন, মা লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ পড়ত তিনি হেঁটে গেলে, তাঁর শাড়ি জামায় গায়ে চন্দনের গন্ধ ছুটত তা নয়, তিনি সাধারণ ছিলেন, ঝগড়া করতেন চেঁচাতেন, মাথা গরম হলে কুশারীদার ঊর্ধ্বতন পুরুষদের উদ্ধার করতেন, কিপ্টেমি করতেন। তাঁর মাথায় যত চুলই থাকুক—সেই চুলও উঠত, গা খসখসে করত, এমন কি জল বসন্ত হয়েছিল একবার মোক্ষম রকমের,

তাঁর ব্যাধিট্যাধিও ছিল, অর্থাৎ সাধারণই ছিলেন তিনি। তবু সাধারণের মধ্যেও তাঁর এমন এক বাহার ছিল যা আমার ভাল লাগত। বউদির গায়ের রং আর গায়ে বুকে টান ছিল।

মানুষ যদি তারের যন্ত্র হত—সেতারিয়া, সরোদিয়া হয়ত ঝঙ্কারে সব তারগুলো বেঁধে নিতে পারত। মানুষ যন্ত্র নয়, সমান ঝঙ্কারে বাঁধা যায় না। তার কোনো কোনো তার সুরে কোনো কোনোটা বেসুরে।

বউদির ভালোটা আমি অনুভব করতাম। মন্দটায় গা ক না।

কিন্তু একদিন কোথায় যে কী ঘটে গেল কে জানে।

আমার স্পষ্টই মনে আছে তখন কার্তিক মাস। হিম কৃষ্ণপক্ষ। কী একটা দরকারে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম বউদিকে।

সুমি তার প্রাইভেট টিউটারের কাছে পড়তে বসেছে লণ্ঠন কুশারীদা গিয়েছে আসানসোলে কিসের কাজে, ফিরতে রাত আরও।

বাড়ির মধ্যে কোথাও না পেয়ে আমি ছাদে চলে গেলাম। মাঝে মাঝে মাথা ধরা ছাড়াতে ছাদে গিয়ে বসত, পায়চারি করত

ছাদে গিয়ে দেখি ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশ ভরা তারা। ছাদের শেষদিকে উঁচু আলসের কাছে। আলসের আড়ালে।

আমার পায়ে চটি ছিল না। শব্দও ছিল না।

ছাদের সিঁড়ির শেষ ধাপ টপকেই আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম আমার চোখ বউদিকে খুঁজছিল।

বউদিকে খুঁজে পেতে আমার দেরি হল না। যত অন্ধ হোক, আর তারার আলোর যত আড়ালেই ওরা থাক, আমি পেয়ে গেলাম। বউদি আর যামিনীবাবু। যামিনীবাবু এক বউদির ভগিনীপতি, কুশারীদার ভায়রা। একদিকে কবিরাজি অন্যদিকে তন্ত্রমন্ত্র। কালীসাধক বলে খ্যাতি। ঘোর

শ্মশান কালীর পুজো করে মাকে সন্তুষ্ট করেছেন। মাথার চুল চুড়ো করে বেঁধে রাখেন। অবশ্য গেরুয়াধারী নয়। পুজো পাঠের সময় রক্তবসন পরেন। বউদির কাছে তাঁর খুব খাতির। থাকেন রানীগঞ্জেই।

বউদি আর কালীসাধক যামিনী যেন শিব-কালীর খেলা খেলছিল। বউদি প্রায় নির্বসনা, নিবিড় শয়না।

বউদির অস্পষ্ট, খুবই অস্পষ্ট, জড়ানো, কাঁপা, লালা-মিশ্রিত দু-একটি স্বর কানে আসছিল। যামিনী আরও চাপা গলায় বলছিলেন, ভয় কিসের! আমি আছি। সাত দিনেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমার হয়ত চলে আসা উচিত ছিল। আসা হল না।

দু পাঁচ পা এগিয়ে যেতেই পায়ের শব্দে ওদের খেলার পালা আচমকা ভাঙল, সুখকালে যেন সর্পদংশন, মিটে গেলে মিথুনাসক্তি। যামিনী দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে গেলেন। খেয়াল করেননি কাছাকাছি ভাঙা আলসে রয়েছে, ভাঙাচোরা ইটের থাক মাত্র সাজানো সেখানটায়।

যামিনী ভাঙা আলসের আলগা ইঁট নিয়ে পড়ে গেলেন। একেবারে নিচে। রাস্তায়।

বউদি কোনোরকমে দু হাত কাপড় বুকে চেপে পালালেন ছাদ ছেড়ে।

যামিনী মারা যাবার আগেই আমি রানীগঞ্জ ছেড়ে পালিয়ে এলাম।

পালিয়ে এলাম যদিও তবু আমার মাথায় একটা অদ্ভুত ধারণা ভর করে থাকল। আমার মনে হত, যামিনীকে আমি যেন তাড়া করে ভাঙা আলসের দিকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কেন? আমি কি তখন চেয়েছিলাম, ও মরুক। হয়ত চেয়েছিলাম। হয়ত ওই কৃষ্ণপক্ষ কার্তিকের রাত্রে অজস্র নক্ষত্রের তলায় আমি চিন্তামণিকে নির্বসনা রূপেই নিজেই তখন কামনা করেছি! কে জানে! কে বলতে

পারে !

আমি কি আগে বলিনি, গত কার্তিকেই আমাদের পাড়ার এক সাধন-ভজনঅলা মৃত ভদ্রলোককে যখন পালঙ্কে শুইয়ে ফুলে ফুলে ঢেকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছিল তার ভক্তরা হরিধ্বনি দিচ্ছিল, কতকগুলো লোক খোল করতাল বাজাতে বাজাতে সামনে যাচ্ছিল শবযাত্রার—তখন বারান্দা থেকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এসে আমরা সেই মৃতদেহ-বহন দেখছিলাম। কে যেন বলল, একটা গেরুয়া চাদর ওর গায়ে বিছানো রয়েছে—রাস্তার আলোয় আমি তা দেখলাম কি দেখলাম না—হঠাৎ আমার কালী সাধক যামিনীর কথা মনে পড়ল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি চলে গেল। অন্ধকার।

এই রকমই তো হয় আমায়। এক চোখ যায় অন্য চোখ জেগে ওঠে, যা আড়ালে অন্ধকারে কোনো তমসালোকে লুকিয়ে ছিল—হঠাৎ দেখি সেখানে আলো পড়ে কত কী উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

কুশারীদের সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি কোনোদিন। বউদির সঙ্গেও নয়। কিন্তু একদিন সুমু—সুমতির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আশ্চর্যভাবে।

আমি তখন কলকাতায় থাকি। ছন্নুবাবুর মেসে। অক্রুর দত্ত লেনে। ভাঙা তক্তপোশ, চিট বিছানা, বাঁকুড়োর মামুলি চাদর, আর একটা লোহার ট্রাংক—আমার সম্পত্তি। এক মুঠো ছারপোকা, ইঁদুর, টিকটিকির সঙ্গে আমার বাস। বেন্টিক স্ট্রিটের এক অবাঙালী দোকানের আমি বিল্‌-বাবু। রোদ বৃষ্টি জল ঝড়ে, শীতে—এক লক্কড়ঝড় সাইকেল চালিয়ে আমি বিল আদায় করে বেড়াই আমার সিন্ধি মালিকের। মালিকের হল শার্ট-প্যান্টের কাপড়ের থান বিক্রির ব্যবসা। তিনি মহাজন। ঘুরতে হয় প্রচুর! খিদেও পায়, তেষ্টাও পায়। টিফিন খরচ মাসে কুড়ি টাকা। শনি রবি বাদ দিয়ে বোধ হয় হিসেবটা করা হয়েছিল।

একদিন তাগাদায় গিয়ে ফিরছিলাম, মাঝ দুপুর, এক আধ পশলা বৃষ্টি শুরু হয়েছে সবে, ফেরার পথে ঝিপ ঝিপ বৃষ্টি এসে গেল।

সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে এক বাড়ির সদরে দাঁড়িয়ে আছি, বিড়ি ধরাচ্ছিলাম—হঠাৎ গলির উলটো দিকের বাড়ির দোতলার জানলায় চোখ গেল। দেখি, একটি বউ আমায় দেখছে, জানলার ময়লা পরদা সরিয়ে।

চিনতে পারিনি। একবার তাকাই, আবার চোখ নামাই।

শেষে দেখি মেয়েটি হাত নেড়ে ডাকছে আমায়।

পাড়াটার মধ্যে কিছু ছাপোষার বাস। পেছনের দিকটা বাজে গলি। কেমন অস্বস্তি হয়।

একটু পরেই ওই বাড়ির সদর খুলে এক ঝি আমায় ডাকতে লাগল। 'ও বাবু, এদিকে এসো।'

বৃষ্টির মধ্যে যাব কি যাব না করে বললাম, 'কেন !'

'দিদি ডাকছে গো !'

কে দিদি ! কেনই বা ডাকছে ?

গেলাম শেষ পর্যন্ত। সাইকেলটা ও-বাড়ির সদরের মধ্যে রাখলাম।

দোতলায় উঠতে হল না, তার আগেই মেয়েটি নিচে নেমে এসেছে। বলল, 'আমায় চিনতে পারলে না, বিশুদা ?'

কলকাতা শহরের আদ্যিকালের বাড়ি। কলতলায় শ্যাওলা, ময়লা, এঁটোকাঁটা, বৃষ্টি পড়ছে, কাঁঠালপচা গন্ধের মতন এক গন্ধ। আলোও কম। তায় মেঘলা।

'আমি সুমি, সুমু। রানীগঞ্জের !'

অবাক হয়ে ওকে দেখতে লাগলাম। পরনে সাধারণ ডুরে শাড়ি, গায়ে লাল জামা, সিঁথিতে সিঁদুর। হাতে শাঁখা আর লোহা-বাঁধানো।

'সুমি ?'

'এসো, ওপরে এসো।'

গেলাম ওপরে।

দোতলায় পাশাপাশি ছুটো ঘর। সরু বারান্দা। একটা খাঁচা ঝুলছে—পাখি নেই। রেলিংয়ে ঝুলছে ভেজা শাড়ি। লাল সায়া।

সুমতি বলল, 'এই ঘরে এসো। ওটা আমার বড় জায়ের ঘর। ভাশুরমশাই আর বড়জা গিয়েছেন চন্দননগর।'

ঘরটায় তালা বন্ধ ছিল।

নিজের ঘরে এনে বসাল সুমতি। শুকনো গামছা দিল মাথা মুছতে। একটা পুরনো পাখা চলছিল মাথার ওপর। ঘরে খাট, আলমারি, দেরাজ। আয়না-লাগানো দেরাজের মাথায়।

'তুমি এখানে?…চিনতেই পারিনি।' আমি বললাম।

'তাই দেখলাম। কেমন আছ বিশুদা? দাঁড়াও, একটু চা খাও!'

'থাক থাক।'

'না' সে কী হয় নাকি! একটু বসো, আমি মাসিকে বলে আসি।'

সুমতি গেল আর এল। এখানে কত দিন?'

'ছু বছরের বেশি। তার আগে দেশে ছিলাম।'

'কী করে জামাই?'

'কোম্পানির চাকরি। ভাশুরমশাইও একই জায়গায় চাকরি করেন।'

'বাঃ! তা এসব হল কবে?' বলে আমি হাসলাম।

সুমতি লজ্জা পেল যেন একটু। বলল, 'তা জেনে তোমার লাভ?

'বল একটু শুনি! সেই সুমি—তোরও বিয়ে হয়ে গেল, বর হল—' বলে আমি হাসলাম। আর এই প্রথম ওকে তুই বললাম, আগে যা বলতাম।

সুমতি বলল, তার বিয়ে হয়েছে বছর চারেক আগে। বিয়ের পর ছু বছর শ্বশুরবাড়ির দেশে ছিল, বর্ধমানের মানকরে। তারপর রয়েছে কলকাতায়। ওর শ্বশুর হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, শাশুড়ি এখনও নিজের হাতে গোরু সামলে ছুধ ছুইতে পারে।

'ডাকাত' শাশুড়ি ?'

'তা বলতে পার।..বঁটি ধরলে মনে হয় সাক্ষাৎ মা কালী!' বলে জেই হেসে ফেলল। ফেলেই জিব কেটে শাশুড়ির উদ্দেশে প্রণাম রল।

'তোর বরের নাম কী রে? নাম বলতে জিব খসবে নাকি?'

'ধুর! বরের নাম, রজনী' বলে সুমতি একটু কান চুলকে নিল। ছবি দেখবে? ওই যে—'বলে একটা বাঁধানো ছবির দিকে আঙুল দেখাল।

দূর থেকে ভাল চোখে পড়ল না। জোড়ের ছবি। বললাম, 'যাবার ময় দেখে যাব। বেঁটে না লম্বা?'

'বেঁটে।' বলে সুমতির কী হাসি। 'বেঁটে বজ্জাত।'

আরও কিছু গল্প হল। চা খেলাম। মিষ্টিও এনেছে মাসি।

'তুমি ঠিকানা দিয়ে যাও, ওকে পাঠিয়ে দেব, তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে।'

দিলাম ঠিকানা।

চলে আসার সময় ভয়ে ভয়ে বললাম, 'সুমি, তোর মা বাবার কথা বললি না? কুশারীদা, বউদি?'

সুমতির মুখের চেহারা কেমন শক্ত হয়ে গেল। রুক্ষ। চোখ নামাল। চুপচাপ থাকল, তারপর বলল, মা ফলিডল খেয়ে মরেছে। মায়ের পেটে একটা বাচ্চা ছিল। মা বাবায় খুব ঝগড়া হত। বাবা মাকে মারত, মা বাবাকে মারত। দুজনে ঝগড়া করতে করতে এমন হল যে, মা ফলিডল খেল। আর বাবা এখন আধ-বুড়ি এক মাগীকে বিয়ে করেছে। সে তোমার বিয়ে না কী—কে জানে! আমি তার আগেই বিয়ে করে নিয়েছিলাম। ভালবাসা করে। ও, তোমাদের ভগিনীপোত—রজনী, তার দিদির বাড়ি যেত রানীগঞ্জে! আমাদের দেখা হত। ভাব-ভালবাসা হল। ওর ভয় ছিল, শ্বশুর শাশুড়ি যদি না মানে! আমি বললাম, বিয়ে না করলে আমি গলায় দড়ি দেব। ওর

মুখ শুকিয়ে গেল। আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমাকে দিব্যি ঘরে নিল। নেবার সময় বাবা ওদের হাতে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা আর তিরিশ পঁয়ত্রিশ ভরি সোনা তুলে দিয়েছিল।'

মানুষ বড় অদ্ভুত! ভালবাসার গায়ে সোনাদানা টাকার সিলমোহর দিতে হয়।

'আমি যাই সুমি?'

'এসো।'

পা বাড়িয়েও কী যেন বলি বলি করেও বলতে পারছিলাম না। সুমতি বুঝে নিল। বলল, 'তুমি যা বলছ, বুঝতে পারছি।

আমি চুপ করে থাকলাম।

সুমতি বলল, 'মা যখন ধড়মড় করে নিচে ছুটে আসছিল সেদিন, আমি পড়া থামিয়ে কলঘরে যাচ্ছিলাম। মাকে ছুটে আসতে দেখেছি। তুমি তো একদিন দেখেছিলে, বিশুদা। আমি ওই দু-জনকে আরও কতবার দেখেছি। কী দেখেছি নাই বা জানলে! আমার মা-বাবার কথা আর বলো না। ঘেন্না ধরিয়ে দেয়।'

আমি কথা বললাম না।

সুমতি আমার সঙ্গে সঙ্গে নিচে এল। বৃষ্টি থেমেছে। 'এই পাড়ায় বেশিদিন থাকব না আমরা।'

'যাই রে!'

'এসো। তুমি বাড়িতে থাকো তো?'

'মেস বাড়ি। সকালে রাতে থাকি।'

'তোমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে। যত্ন করো না?'

'যত্ন করার পয়সা পাই না রে!'

'একটা বিয়ে করবে?'

'বিয়ে?'

'কলকাতার হাসপাতালে কাজ করে। সম্পর্কে আমার ননদ জানাশোনা। করো না বিয়ে। দেখতে মোটামুটি। করবে?'

হাসতে হাসতে বললাম, 'মেয়েটাকে আগে দেখি। তারপর—'

'বেশ!' সুমতিও হাসতে লাগল।

॥ পাঁচ ॥

একটা সময় গিয়েছে যখন আমার চোখের দৃষ্টি চলে গেলে াড়িতে হুলস্থুল পড়ে যেত। উদ্বিগ্ন চঞ্চল হয়ে উঠত সকলেই। াটাছুটি শুরু হত, ধরনা চলত ডাক্তারদের চেম্বারে চেম্বারে। ·এখন আর ও-সব হয় না। উদ্বেগ দুশ্চিন্তা অল্প-স্বল্প থাকে অবশ্য, ন্তু হইচই থাকে না। ব্যাপারটা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। অন্তু ানে, তার বাবার এই অদ্ভুত রোগ সারার নয়, যদি না অত্যাশ্চর্য ছু ঘটে যায়। এমন কি উলটোও ঘটতে পারে, তার বাবা াবরের মতন অন্ধ হয়ে যেতে পারে। প্রথম সম্ভাবনাকে সে তটা মেনেছে জানি না। দ্বিতীয়টা হয়ত মেনে নিয়েছে মনে নে। বউমা মুখে কিছু বলে না, তবে আশা-ভরসা বিশেষ করে । আমার বউমার কোনো দোষ আমি ধরছি না। সে তো ভালই। ন্তু শ্বশুরের এমন একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যাধি নিয়ে সে আর কী করতে রে!

আমিও ব্যাপারটা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। যা হবার ব। যদি বরাবরের মতন চোখ দুটো চলে যায় যাবে, কী আর তে পারি! যা অবধারিত সেটা যে কী আমি জানি না, আমাকে নে নিতেই হবে।

আমার নাতিই দেখেছি, এখনও আমার অন্ধ দিনগুলিতে বেশ ড়ে পড়ে। পড়ে কারণ, ঘরের মধ্যে আমি তার খেলার সাথী, র বকবকানির নিবিষ্ট শ্রোতা। তার মা-বাবা তার সঙ্গে কি লুডো

খেলবে? খেলবে চাইনিজ চেকার, হর্স রেস? নাকি বো
ক্রিকেট? অরণ্যদেব আর টিনটিনকে নিয়ে কে তার সঙ্গে বক
করবে? কার সঙ্গে তার সিন্দবাদ নাবিকের গল্প হবে? কিংবা
তাকে তার ঠাকুমার গল্প করবে— ! আস্ত এক ভূতকে দেখার পর
তার ঠাকুমা কেমন আদর করে, লুচি আর আলুর দম খাইয়েছি
ভূতটাকে !

নাতিই একদিন চটেমটে আমায় বলেছিল, 'দাদা, তুমি নটি
ছিলে !'

'নটি বয়?'

'ভীষণ নটি বয়। তুমি চোখের মধ্যে কিছু ঢুকিয়েছিলে?'

'না রে !'

'মিথ্যে কথা বলো না। মিথ্যে কথা বলা পাপ। ...তুমি কাঁ
আলপিন, সেফটিপিন কিছু ঢুকিয়ে ম্যাজিক দেখাতে গিয়েছিলে
ছুঁচ ঢুকিয়ে ছিলে !'

'না রে ভাই, আমি ম্যাজিক দেখাতে জানতাম না। একব
ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে কাচভাঙা চিবুতে গিয়েছিলাম। জিব-গ
কেটে মরে যাই।'

'তুমি ভীষণ মিথ্যুক। তুমি নিশ্চয় চোখে ছুঁচ ঢোকা
গিয়েছিলে ম্যাজিশিয়ানদের মতন। ম্যাজিশিয়ানরা কায়দা জা
তুমি জানো না। ওদের হাতসাফাই আছে তোমার নেই।'

নাতির কথায় হেসে মরেছি। আমি নাকি ছেলেবে
ম্যাজিশিয়ান হতে গিয়েছিলাম। আমার হাতসাফাই, কায়দা-কা
জানা ছিল না ম্যাজিক দেখানোর, ফলে কোনো একটা বি
গণ্ডগোল করে ফেলেছি! কী জানি! তবে হ্যাঁ, কত ম্যাজি
দেখলাম জীবনে।

অন্য অন্য বার যাই হোক, এবার দৃষ্টিহীন হবার পর আমি

নিজেই বড় অস্থির হয়ে উঠছিলাম। আমার ব্যাধির জন্যে নয়। ওটা দশ পনেরো কি কুড়ি দিনের মধ্যে কেটে যাবে, যদি না একান্তই কপাল মন্দ হয়। আমার অস্থিরতার কারণ কমলা। সেই কমলা, যে আমার প্রথমা স্ত্রী ছিল। টেলিভিশনে যাকে আচমকা কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখলাম আজ, কত বছর পরে, প্রায় না তিনযুগ! জানলাম সে এখন নিরুদ্দেশ, তার ঘর বাড়ি ছেড়ে দিন সাতেক আগে চলে গেছে।

কমলাকে এত বছর বাদে দু পলক দেখে আমি তাকে চিনে নেব—এমন কি হয়? হয় না। বিশেষ করে টেলিভিশনের পর্দায়, যা ছোট ছাড়া বড় নয়, আবার সেই পর্দারও সামান্য অংশ জুড়ে তার আধা-অস্পষ্ট একটা ফটো দেখলেই কি আমার মতন বৃদ্ধের চোখ চট করে মানুষটাকে চিনে নিতে পারে। নিশ্চয় পারে না। পারা প্রায় অসম্ভব।

তবে কেমন করে চিনলাম? নাম শুনে? না, একেবারেই নয়। কমলা নামটা আমাদের বাঙালি ঘরের মেয়েদের মধ্যে হর-হামেশাই শোনা যায়। সাধারণ নাম। ঘরে ঘরে দু একজন কমলা বিমলা রমা পাওয়া যায়।

নামে তাকে চিনে ফেলেছি এটা ঠিক নয়, যদিও নামটা কানে লেগেছিল। কেউ যদি সুধীরচন্দ্র নাম বলে, সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবাকে মনে পড়তে পারে। আমার বাবার নাম ছিল সুধীর। আশালতা নাম শুনলে ছোট মা-র কথা মনে পড়বেই। মনে পড়াটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু চিনে নেওয়া? চিনে নিতে পারলাম নিরুদ্দিষ্ট কমলার কয়েকটা বর্ণনা শুনে। হ্যাঁ, কমলার গায়ের রঙ ফরসা ছিল—ওরা যেমন বলল। তবে ধবধবে ফরসা নয়, চাপা ফরসা। বয়েসটাও ওরা মোটামুটি ঠিক বলল, সাতান্ন! কমলার বয়েস এখন ছাপ্পান্ন সাতান্নই হবে। আমার চেয়ে বছর ছয় সাতের ছোট ছিল সে! চিবুকের তলায় আঁচিলের কথা, আর গলার বাঁ

পাশে কাটা দাগের কথাও আমার কানে গিয়েছিল। কমলার ঠিক ওই চিহ্নগুলোই ছিল, চিবুকের তলায় বড় আঁচিল আর বাঁ গলায় কাটা দাগ। চোখের মণি কটা রঙের। তাও ওরা বলেছে।

এরপর না চেনার কোনো কারণ থাকতে পারে না কমলাকে। আরও দু একটা কথা বলতে পারত। বলেছে কিনা আমার মনে নেই, কেননা ফটোটা দেখতে দেখতে আর চিহ্নগুলোর বর্ণনা শুনতে শুনতে এত বেশি চমক খেয়েছি, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি যে, কানে আমার সব কথা ঢুকছিল না, চোখের দৃষ্টিও নিভে গেল।

ওরা না বলুক, জানুক না জানুক—আমি জানি, কমলার পিঠে কালো এক বড় জড়ুল ছিল; তার বুকে ডান স্তনের তলায় কিছু রোম ছিল বড় বড়, খয়েরি রঙের, আর ডান হাতের কড়ে আঙুলের নখের চারদিক ক্ষয়ে গিয়েছিল। ফাংগাস ইনফেকশান বলত ডাক্তাররা অন্য কিছু লক্ষণও ছিল যা প্রকাশ্যে বলার নয় বলেই বলা হয়নি।

কম হোক আর বেশী হোক, একবার যদি চেনা মানুষকে কেউ আভাসেও ধরিয়ে দেয়—তাকে চিনতে অসুবিধে কোথায়? আর কমলা তো আমার প্রথম স্ত্রী ছিল, যাকে আমি ভাল করেই চিনতাম। নিজের স্ত্রী—একদার স্ত্রীকে কে ভোলে? বছর বত্রিশ তেত্তিরিশ আগে যে আমার স্ত্রী ছিল তার চেহারা পুরোপুরি আমার মনে না থাকার কথা। তখন তার যা চেহারা ছিল এত বছর পরে সেই চেহারা কেমন করে থাকবে? যদি বা আদল থাকে, তবু দু পলকের দেখায় কি চেনা যায়! ও যদি আমার সামনে রক্ত মাংসর শরীর নিয়ে হাজির হত, দাঁড়িয়ে থাকত কিছুক্ষণ—কমলাকে আমি চিনে নিতে পারতাম। ঘটনাটা যে অন্যভাবে ঘটল।

চিনতে আমার যেটুকু সময় লেগেছিল, তারপর আর কিছুই আটকাল না। গোটানো ফিতে খুলে যাবার মত কমলার আর আমার জীবনের সেই পর্বটাই খুলে গেল পুরোপুরি।

কোনো কি কারণ ছিল দুঃখ পাবার? তবু আমার দুঃখ হচ্ছিল। কষ্ট হচ্ছিল এই ভেবে যে, কমলা নাকি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ঘর ছেড়ে চলে গেছে। হয়ত এক বসনে। উদ্বিগ্ন হওয়া আমার উচিত ছিল না। তবু উদ্বেগ হচ্ছিল। নিজের সাময়িক অন্ধত্বকে বোধ হয় আমি অভিশাপ দিচ্ছিলাম, চঞ্চল ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম।

নিজের প্রথমা স্ত্রীকে আমার পুরোপুরি পরিষ্কারভাবে মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল, কীভাবে, কেমন করে ও একদিন আমার স্ত্রী হয়ে উঠেছিল।

আমার অক্রূর দত্ত লেনের ছন্নুবাবুর মেসে সত্যিই একদিন সুমতির স্বামী রজনী এসে হাজির।

ছেলেটি দেখতে বেঁটে। ছিপছিপে। ডাগর চোখ। কোঁকড়ানো কালো চুল। একটু লাজুক ভীতু-ভীতু ভাব চোখে মুখে। এসে বলল, সুমতি পাঠিয়েছে।

আমার মেসের তক্তপোসের নোংরার মধ্যে ওকে বসাতে লজ্জা করছিল। বললাম, চলো, পার্কে গিয়ে বসি।

ক'দিন আর বৃষ্টি-বাদলা ছিল না। মাঠ শুকনো। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মাঠে বসে ঝালমুড়ি আর ভাঁড়ের চা খাওয়া হল। রবিবারের পার্ক। ভিড়টিড় সামান্য ছিল। গল্পটল্প হল দুজনে। ছেলেটিকে ভালই লাগল আমার। খানিকটা এলোমেলো, তবে শান্ত, সুবোধ।

দ্বিতীয় দফায় রজনী এল সুমতির চিঠি নিয়ে।

সুমতি লিখেছে: "বিশুদা, বিয়ের কথা আমি ভুলিনি। তোমাকেও ভুলতে দেব না। আমার ননদকে একবার দেখবে? দেখো না। আমি তাকে তোমার কথা কিছু বলিনি। একবার দেখো। তোমার পা ধরছি।"

চিঠি পড়ে আমার হাসি পাচ্ছিল। কে কাকে দেখে? আমি হলাম—সব দিক দিয়ে মামুলি। চেহারায়, বিদ্যাবুদ্ধিতে। মাসে

একশো চল্লিশ টাকা আমার রোজগার। আমার নিজস্ব বলতে গোটা তিনেক আধ-ময়লা ধুতি। একটা লুঙ্গি শার্ট পাঞ্জাবি গোটা তিন, ছেঁড়া ফুটো গেঞ্জি একজোড়া, আর দু পাটি ছেঁড়া চপ্পল। হপ্তায় একদিন দাড়ি কামাই।

রজনীকে বললাম, ধ্যুত্, তোমার বউটি পাগল!'

রজনী হেসে বলল, আপনার বোন। দুষছেন কেন। তবে ও পাগলের বেশি, উন্মাদ।'

'তুমি সুমতিকে বলে দিয়ো, আমার অবস্থায় বিয়ে করা চলে না।'

রজনী বলল, আপনি নিজে গিয়ে বলে আসুন না। আমায় যে ছিঁড়ে খাচ্ছে, দাদা।'

'ম্যানেজ করে নিতে পারছ না।'

'কোথায় আর পারছি।'

রজনী বলল, 'আপনাকে নিতে এসেছি। দুটো খেয়ে আসবেন বোনের বাড়িতে। গঙ্গার ইলিশ আনিয়ে খিচুড়ি করেছে।'

'এই জলে বৃষ্টিতে?'

এখান থেকে আর কতটুকু পথ! চলুন। ...আপনি নাকি মুখ ফুটে খেতে চেয়েছিলেন সুমির কাছে!'

তামাশা করেই বলেছিলাম অবশ্য। এখন না গেলে ভাল দেখায় না। বললাম, 'চলো।'

ছেঁড়া ছাতা মাথায় হাঁটুতক কাপড় তুলে গেলাম সুমতির বাড়ি।

আজও তার ভাশুর আর বড় জা নেই। এ বড় অবাক কথা। বার দুই তিন ও-বাড়ি গেলাম, একবারও সুমতির ভাশুরমশাই বা বড় জাকে দেখলাম না। ঘর তালাবন্ধ থাকে। সুমতি বলল, 'বড় জায়েরবাপের বাড়িতে দক্ষযজ্ঞ চলছে। তাই বার বার বাপের বাড়ি যায়।'

রজনী বলল. 'প্রপারটি ওয়ার ওদের। বউদি যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়তে নারাজ। দাদাকেও ধরে নিয়ে যায়।'

ভাশুরমশাই, বড়-জা না থাক সুমতির, তার সম্পর্কের ননদটি ছিল। কমলা।

কমলাকে সেই আমি প্রথম দেখলাম। চমক লাগল না, চিত্ত চাঞ্চল্যও হল না তেমন। কমলার বয়েস তখন তেইশ চব্বিশ হবে। বৃষ্টিভেজা দিনের মতন যেন চাপা ঘোলাটে বিষণ্ণ লাগল। কথাও বেশি বলল না।

মেসে ফিরে রাত্রে ঘুমের মধ্যে কিন্তু কমলাকে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। সে আমার মাথার তলায় বালিশ গুঁজে দিচ্ছে নতুন ওয়াড় পরিয়ে, আমার হাতে পান তুলে দিল; নিজের চুলের গোছা দু হাতে জড়িয়ে কী যেন বলছে হাসিমুখে।

সকালে ঘুম ভাঙলে বুঝলাম কমলা আমার মনে ঠাঁই নেবার জন্যে পা বাড়িয়েছে। বা আমি তার জন্যে মনের দরজা খুলে দিয়েছি।

কমলার সঙ্গে বার চারেক দেখাসাক্ষাৎ হল। মেডিকেল কলেজের উলটো দিকে থাকে ও। গলির মধ্যে। বাড়ির নিচের তলায় বাঁশি তৈরীর দোকান, তার পাশে গয়নার বাক্স তৈরি হয়। দোতলায় কমলার বয়েসী তিন চারটি মেয়ে। হাসপাতালে কাজ করে কেউ, কেউ ডাক পেলে বাবুদের বাড়িতে আঁতুড়ে-থাকা বউদের দেখাশোনা বাচ্চা সামলাতে যায়।

সুমতির কথায় কিছু ভুল ছিল। কমলা হাসপাতালের নার্সটার্স ছিল না তখন। খাতা-লেখার কাজ করত স্টোরে। কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে একটা নার্সেস ইউনিয়ন খুলেছিল। তাদের কাজকর্মের ব্যবস্থা দেখত, এ-বাড়ি ও-বাড়ি পাঠাত। ব্যবসাটা তার মন্দ চলছিল না। আসলে তার মায়ের দৌলতেই শুরু হয়েছিল ব্যবসা, মা হুঠ করে মারা যাবার পর তার ঘাড়ে পড়েছিল সব।

না বয়েসে, না বুদ্ধিতে সে এই ব্যবসা চালাবার যোগ্য। তার হাতের মুঠো আলগা হয়ে আসছিল।

আমরা যে প্রেম-ভালবাসা করেছিলাম তাও নয়। ভেতরে কোথাও

রজনী বিপদে পড়েছিল প্রথমবার, কলকাতায় আসার পর পর। হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছিল সুমিকে দু এক দিনের জন্যে। তারপর বাড়ি। কমলার সঙ্গে তখনেই কেমন করে আলাপ। তখন থেকেই ওদের ভাবসাব। সুমি কমলাকে দিদি বলে ডাকত। কমলাও ভালবেসে ফেলেছিল সুমিকে। সেই হিসেবে ও হল সুমির ননদ।

অক্রূর দত্ত লেনের ছনুবাবুর মেস থেকে বাক্স গুটিয়ে আমি চলে এলাম কমলার কাছে।

বিয়েও হয়ে গেল আমাদের। সই-সাবুদ করে। কমলা মোটেও নিরক্ষর ছিল না। স্কুলে পড়া মেয়ে। তার মা তাকে গুণবতী করতে চেয়েছিল। পারেনি।

বিয়ের পর কমলা মাস ছয় আট তার মায়ের পুরনো ব্যবসা দেখল। আমাকেও দেখতে হচ্ছিল। শেষে বলল, আপদ বিদেয় করে দাও। বেনো জল বাড়িতে ঢুকতে দেব না আর।

পরের বছর আমরা পাড়াটাও ছেড়ে দিলাম। দিয়ে নিয়োগী লেনের এক বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। আমি এক চাকরি পেয়েছিলাম। তুলসীচরণ আঢ্যির কড়াই কম্পানিতে। তুলসীচরণ জাত বৈষ্ণব। তাঁর কড়াই কারখানা ছিল শিয়ালদা আর বেলেঘাটার মাঝামাঝি। কড়াই ছিল দু রকম। 'দুর্গা' মার্কা কড়াই, আর 'শঙ্খ' কড়াই। দুর্গা কড়াই এক নম্বর। কড়াইয়ের সঙ্গে হাতা খুন্তি ছাঁকনিও ছিল। বিয়ে সাদি অন্নপ্রাশনের রাঁধুনি ঠাকুরদের হাতে যেগুলো দেখা যায়—সেই জাতের হাতা খুন্তি। ভাল ব্যবসা। শিয়ালদা আর বউবাজারের মুখে দুর্গা কড়াইয়ের মস্ত দোকান। পাইকারদের জন্যে বড়বাজারেও দোকান ছিল।

আমার কাজ ছিল বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়ে দুর্গা কড়াইয়ের কাটতি বাড়ানো। মফস্বল গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াতাম। মাসের মধ্যে দিন দশ পনেরো বাইরে। বাকিটা কলকাতায়। মাইনেপত্র, আসা-

যাওয়া, খাই-খরচা মিলিয়ে চার পাঁচশো টাকা রোজগার হত।

কমলার হাতেও টাকাপয়সা ছিল কিছু।

জীবনে সেই প্রথম, ছেলেবেলায় মা-বাবার কাছে থাকার সময়টুকু বাদ দিলে, আমি পরিষ্কার ঘরে থাকতে পেরেছি, শুতে পেয়েছি তকতকে বিছানায়, দু'বেলা মুখে তোলার মতন খাবার পেয়েছি।

কমলার মধ্যে গুণ ছিল। সে যে কত মন দিয়ে সংসার করতে পারে দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। তার হাতে পড়ে পড়ে ঘরদোরের সঙ্গে আমার শ্রীও ফিরে আসছিল। তবে ওই যে মাসের অর্ধেকটা বাইরে বাইরে কাটাতে হত—তাতেই শরীরে পুরোপুরি চেকনাই আসছিল না।

আমরা ভাল ছিলাম।

এমন সময় বড় ধাক্কা লাগল এক। সুমতি মারা গেল। হাসপাতালে ছিল সে; বাচ্চা পেটে নিয়ে। কী যে হল কে জানে, মা আর বাচ্চা দুই-ই গেল। আমি যে মনে মনে ওই সুমি মেয়েটাকে কত ভালবাসতাম শ্মশানে গিয়ে বুঝলাম। কোন মানুষ কখন আপন হয়ে যায়, কোন আপন পর হয় কে জানে! সুমি আমার বোনের বাড়া হয়ে গিয়েছিল। বুক ভেঙে কান্না আসছিল। রজনীকে সামলাবার মতন ক্ষমতাই ছিল না আমার। কমলাও কেঁদেকেটে মরে যাচ্ছিল। সুমিকে ও বোধ হয় আমার চেয়েও বেশি নিজের করে নিয়েছিল।

শোকপর্ব দীর্ঘকাল চলে না। মানুষ আবার দুঃখের তলা থেকে মাথা উঠিয়ে ভেসে ওঠে। আমরাও উঠলাম।

একদিন রাত্রে সুমতির কথা উঠলে কমলা বলল, 'প্রথমবার ওর যখন নষ্ট হল তখনই বলেছিলাম, তুই সাবধান।'

'কেন?'

'ওর ভেতরের দোষ ছিল।'

'কে বলল?'

'ডাক্তাররাই বলেছিল। ...একবার নষ্ট হল, দু বার হল...'

'দু বার ?'

'সেবার পেটে এসেই নষ্ট হয়েছে বলে হাঙ্গামা হয়নি। অন্নের ওপর দিয়ে গিয়েছে। এটা তিন বার ··।'

'এবার তো বাচ্চা প্রায় পুরোই হয়েছিল।'

'কই আর, দেরি ছিল পুরো হতে!' বলে কমলা আমাকে যা বোঝাল তাতে মনে হল, সুমতি কোনো দিনই মা হতে পারত না। তার এমন দু-একটা শারীরিক গণ্ডগোল ছিল যে সে মা হবার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত সে সম্ভাবনা কমই ছিল। এই গণ্ডগোলগুলো হত জন্মগত, হয়ত বোঝা যেতে পারত কিশোরী বয়েসের মাঝামাঝি বা শেষ থেকে।

সুমতি মারা যাবার পর তার স্বামী রজনী যেন আমাদের কাছে ছিটকে এসে পড়ল। ঝড়বৃষ্টি বা বাইরের অন্ধকার থেকে যেমন ভীতার্ত পাখি নিজেকে বাঁচাতে কোনো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে অনেকটা সেই ভাবেই রজনী আমাদের কাছে এসে গেল। আশ্রয় খুঁজল।

কমলা তাকে সান্ত্বনা দিত, শোকতাপ হালকা করে দেবার চেষ্টা করত। কমলাই তার বেশি দিনের পরিচিত, ঘনিষ্ঠ। অনেকটাই আপনজন। কমলাকে সে 'দিদি' বলত—যদিও ওদের বয়েসের হেরফের ছিল না। সমবয়সীই প্রায়। রজনী একটু বড় হতে পারে।

রজনীকে আমিও সমবেদনার সঙ্গে দেখতাম। তার অমন ভয়ংকর শোক ভোলাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু প্রথমে না বুঝলেও পরে দেখলাম, রজনী তার কমলাদির ওপরই বেশি আস্থাশীল। হয়ত কমলা মেয়ে বলে, হয়ত কমলা ওর পূর্ব পরিচিত ঘনিষ্ঠ বলে। তা ছাড়া সে আমাদের বাড়িতে কমলার সান্নিধ্যই বেশি পেত। আমাকে তো মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন মফস্বলে গাঁয়েগঞ্জে ঘুরে বেড়াতে হত।

মাস ছয় কি আরও দু একমাস পরে দেখলাম, রজনী আমাদেরই সংসারে এসে পড়েছে প্রায়। সে আমাদের বাড়িতেই বেশির ভাগ

সময় থাকে, খায় দায়, ঘুমোয়। আমাদের বাড়ি থেকেই অফিস যায়। হাটবাজার করে। মাঝেমাঝে কমলাকে নিয়ে সিনেমাটিনেমায় যায়।

'একদিন আমি কমলাকে বললাম, 'রজনীর দাদা কি ভাইয়ের খোঁজ-খবর করে না ?

কমলা বলল, 'না।'

'কেন ?'

'ওর দাদা-বউদি বরাবরই ওই রকম। তা ছাড়া এখন তারা চন্দননগরে গিয়ে রয়েছে। কলকাতার বাড়ি ছেড়েই দিয়েছে।'

'অদ্ভুত !'

'কিছুই অদ্ভুত নয়। সুমতি তোমায় সত্যি কথাটা জানায়নি। ওর ভাসুর, জা—কেউই নিজের নয়। জ্ঞাতি। সুমতিদের দরকারের সময় নিজেদের ভাড়াটে ঘরের একখানা ভাড়া দিয়েছিল। ভাসুর লোকটি ঠগ জোচ্চোর, তার বউ আরও নচ্ছার। ওরা টাকাপয়সা সম্পত্তির লোভে বাপের বাড়িতে গিয়ে শেকড় গেড়ে বসেছে।'

সুমতি যে কেন আমায় কথাটা বলেনি কে জানে ! জগতে ঠগ জোচ্চোর লোভী তো থাকেই।

অন্য এক ঘটনা ঘটল এই সময়ে।

আমি মফস্বলে মফস্বলে ঘুরে বেড়াই। দুর্গা কড়াইয়ের বাজার উঠছে ভালই। আমার মালিক তুলসীচরণ একদিন ডেকে হুট করে আমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিল। দিয়ে আদর করে বলল, 'একটি বার ওই ঘাটশিলা টাটানগর রাঁচিটাঁচি ঘুরে এসো তো বাবা ! ওদিকে আমাদের মাল দেখি বছরে হাজার পাঁচ সাত টাকারও যায় না। শহরে না যাক, ছোট ছোট জায়গায় তো যাওয়া দরকার। ভাবছি বাজারটা তোমাকে দিয়ে পরখ করিয়ে নি। যাও একবার ঘুরে এসো। দরকার হয় মাসখানেক ধরে চষে ফেলবে সব। খরচা-টরচার কথা ভেব না। পেহ্লাদের কাছ থেকে পাঁচ সাতশো টাকা

খাতায় লিখিয়ে নিয়ে যাও।'

মনিবের হুকুম, আমি তো তাঁর দাস। তায় আবার পঞ্চাশ টাকা মাস মাইনে বেড়ে গেল।

কমলা বলল, 'তুমি কেন বললে না, ভিক্ষে চাই না।'

'ভিক্ষে?'

'পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে মাথা কিনেছে নাকি! কী দাম এখন পঞ্চাশ টাকার?'

পঞ্চাশটা টাকা কমলার কাছে ফেলনা হলেও আমার কাছে কম ছিল না। হেসে বললাম, 'সবুর করো। ফল কি একদিনে পাকে! সময় লাগে! তুলসীচরণের কারখানায় আমার একদিন পাকা জায়গা হবে।'

কমলা বলল, কোনো দিনই হবে না। তুমি বোকা, তুমি সাফ কথা বলতে শেখোনি। এ জগতে মুখ বুজে থাকলে মার খেতে হয়। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।'

তখনও শীত ফুরোয়নি। সুটকেশ হোল্ডঅল গুছিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। যাবার সময় মনে হল, শরীরটা বিগড়ে রয়েছে। আমি যখন বাড়ির বাইরে ট্যাক্সি ধরছি, রজনী একটা রিকশা থেকে নামল, বাঁ হাতের তালুতে জড়ানো মোটা ব্যাণ্ডেজ। বলল, ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা কেটেছে। পায়ের কাছে প্যান্টের হাঁটু ছেঁড়া ফাটা। ব্যাণ্ডেজ জড়ানো।

কমলা বাইরে দাঁড়িয়ে। রজনী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সদরে গিয়ে দাঁড়াল। কমলা বলল, 'হাত পা কেটে এলেই পারতে? ট্রামে উঠতে নামতে শেখোনি!'

রজনী কিছু, বলল না। মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকে গেল।

ঘোরাফেরা করতে করতে এক-গা জল বসন্ত নিয়ে আমি এক ছোট রেল স্টেশনে এসে হাজির। কে ভেবেছিল, এই বুড়ো বয়েসে এমন

এক বাজে রোগ এসে ধরবে আমায় পথের মধ্যে।

কাঠের কারবারী প্রফুল্লবাবু আমায় রেল স্টেশনে নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'মশাই, ভাববেন না। দিন পনেরো একলা ঘরে গড়াগড়ি করুন। এ-রোগে মানুষ একটু ভোগে, মরে না।'

প্রফুল্লবাবু আমাকে রেল স্টেশনের মাস্টারবাবুর কাছে জিম্মা করে দিলেন। বললেন, 'ওহে মিত্তির, একে একটু দেখো। বাঙালির ছেলে। আমায় একবার চাঁইবাসা ছুটতে হবে। তোমায় ভাই বিপদে ফেললাম। তবে কী জান! তুমি হলে স্বয়ং শিব। তোমার হল নীলকণ্ঠ।'

স্টেশন মাস্টার শিবচন্দ্র মানুষটি ভাল। সদাশয়। তায় আবার ঘরে বসে হোমিওপ্যাথি করেন। নিজের কোয়ার্টারের গায়ে এক ফালি খালি কোয়ার্টার পড়ে ছিল। সেখানে আমার ঠাঁই হল দড়ির খাটিয়ায়।

জল বসন্তও যে কী ভয়ংকর হতে পারে আমি জানতাম না। এ যেন আসল বসন্তকে ছাপিয়ে যায়। সে যে কী কষ্ট কেমন করে বোঝাব। সারা গা, হাত, পা, পেট. চোখ মুখ আর আমার থাকল না। মনে হচ্ছিল কোনো অসহ্য যন্ত্রণা মাংসচামড়া ভেদ করে উঠে এসেছে, আমার নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, কাঁদবার উপায় নেই, আমি একটা পচা মাংসের স্তূপ হয়ে পড়ে আছি।

কলকাতায় কমলাকে চিঠি লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম কমলা আসবে। আসেনি কমলা। চিঠির জবাবে লিখেছিল, রজনীর হাঁটুর কাছে হাড় ভেঙেছে। সে হাসপাতালে। তার জন্যে দৌড়ঝাপ করছে। আসবে কেমন করে?

সারা মুখের বিশ্রী চেহারা নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম একদিন। আমার মুখ যেন কত বদলে গেছে। কালো কালো দাগ, কোথাও কোথাও তখনো ছাল শুকোয়নি পুরোপুরি। গায়ের জামা গেঞ্জি খুললে চমকে উঠতে হয়। পেট পা দাগে দাগে ভরতি।

কমলাও চমকে উঠল। বলল, 'এ কী!'

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

হাঁটুর হাড় জোড়াতালি লাগিয়ে রজনী ফিরে এসেছে বাড়িতে। দেখলাম, সে শুয়ে শুয়ে কাগজ-টাগজ পড়ছে। আমায় দেখে উঠে বসল। পায়ে হাত রেখেই। বলল, এ কী দাদা? চিকেন পক্স এই রকম হয়? সাংঘাতিক তো!'

আমি কী মনে করে বললাম, 'সেপ্‌টিক হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। বেশি বয়েসে হল তো! ধাক্কাটা জোরই হয়েছিল।'

আমার গলার স্বর যে স্বাভাবিক নয়, তাতে ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ মেশানো ছিল রজনী বুঝতে পারল।

রাত্রে কমলার সঙ্গে আমার যে-ঝগড়া হল তার বৃত্তান্ত আর দিতে চাই না সব। শুধু দু-চারটে জরুরি কথা বলি।

কমলা আমায় শেষমেশ বলল, 'তুমি আমায় সন্দেহ করেছ?'

'করেছি।' কমলা সাফ কথা না শুনতে চেয়েছিল।

'আমি সেটা বুঝতে পারছিলাম আজকাল।'

'ভালই করছিলে।'

কমলা বরাবরই স্পষ্টবাদী, দুর্মুখ। রাগে তার চোখ যতটা জ্বলার কথা জ্বলল না। তার গলার স্বরও তেমন কর্কশ হল না। থমথমে ঝড়ের মতন মুখ করে বলল, 'তা হলে?'

'আমি আর থাকব না এখানে। তুমি থাকো, তোমরা থাকো।'

কমলার কী যে হল কে জানে, হঠাৎ নিজের বুকের আঁচল খুলে গলায় জড়াল ফাঁসের মতন করে। বলল, 'তুমি আমার গলা টিপে মেরে ফেলো। আমায় তুমি খুন করো। আমি রজনীকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না। তুমি আমায় ফাঁসি দিয়ে দাও।' বলে কাঁপতে লাগল থর থর করে। বুকের জামা ছিঁড়ল। মাথার চুল করল রাক্ষুসির মতন। তারপর কাঁদতে লাগল।

কমলাকে ছেড়ে চলে এলাম আমি। সে বারণ করল না, পায়ে

ধরল না। রজনী চোরের মতন হয়ে থাকল।

আমি বুঝতে পারলাম, রজনী আর কমলার মধ্যে সুমি যেন ছিল একটা আড়াল, চিকের মতন। সুমির ওই আড়াল থেকে ওরা দুজনে দুজনকে দেখতো। হয়ত সুমি সেটা বুঝেছিল, বা জানত। জেনেই কমলাকে আমার কাছে ঠেলে দিয়েছিল, যদি তার পাতানো ননদ অন্যের স্ত্রী হয়ে, স্বামীর সংসার করে নিজেকে শুধরে' নিতে পারে।

সুমি যা চেয়েছিল তা হয়নি।

ভালবাসা কী আমি জানি না। তার চেহারাও বিচিত্র। সে ভাল, সে নোংরা ; তার হাতে ফুল থাকে শুনেছি, আবার তার নখের আঁচড়ে বিষও থাকে। আমার তো তাই মনে হয়েছিল পরে। আকাশ তো কত ভাল, কখনো নীল, কখনো সাদা, কখনো গোধূলির আলোয় রাঙা। আবার সেই আকাশই কালবৈশাখীতে কী ভয়ংকর, মেঘে মেঘে যখন আবৃত থাকে কী বিদঘুটে কালো, ওই আকাশের মেঘ ডাকে, বিদ্যুৎ চমকায় ভীষণ করে।

কমলার ভালবাসা নিয়ে শুধু নয়, মানুষের ভালবাসা নিয়েও আমি ভেবেছিলাম। ভেবে অনুভব করেছিলাম, তার কোনো বিশেষ রূপ নেই। জগতেরই কী আছে! ভালবাসা সব রকমই হতে পারে। কোন্ গোপনে তার আসা-যাওয়া, কোন অতলে সে বয়ে যায় —কে জানে!

কমলার সঙ্গে আমার সম্পর্কের সেই শেষ। এমন কি পরে কাগজে পত্রেও।

রজনী তাকে বিয়ে করেছিল। 'দিদি' বলে যাকে ডাকত—সেই দিদিকেই। ডাকটা মুখের, আকাঙ্খাটা হৃদয়ের।

কমলার কোনো খবর আর আমি রাখিনি। সেও আমার খবর রাখত না। পর্বটা শেষ হয়ে গিয়েছিল নিয়োগী লেনের বাড়িতেই।

॥ ছয় ॥

যাবার পালা পড়লে বুঝি এক এক করে অনেক অনেক কিছুই যেতে থাকে।

কমলা গেল একদিন তুলসীচরণও গেল। তুলসীচরণের পেহ্লাদ বলল, আমি রাহা খরচ, ঘোরাঘুরির খরচ বেশি করে দেখাই। টাকা তুলে নিয়ে ফুর্তিফার্তা করে বেড়াই, কাজের কাজ করি না।

বললাম, বেশ করি শালা! তোর বাপের টাকা!

গদিতে ঝগড়া লেগে গেল। পেহ্লাদ বলল, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবে আমার।

আমি বললাম, 'যা রে শালা, তুই আমায় জুতোবার আগে আর-একবার মায়ের গভ্ভ থেকে ঘুরে আয়।'

আমার মুখের ভাষা খিস্তি খেউড় শুনে তুলসীচরণ কানে আঙুল দিল।

দিলাম ছেড়ে তুলসীকে। তখন আর এমন কি বয়েস! গায়ে মাথায় রক্ত ফুটছে। কমলা আমাকে নোংরা নচ্ছার করে রেখে গেছে। জগৎটাকে আমি গ্রাহ্য করব না যেন—এমন পণ।

আবার এক চাকরি জুটল। আবার ঠাঁই নিলাম বউবাজারের এক মেস বাড়িতে।

সেখানে থাকতে থাকতে একবার মেসের বন্ধু জগন্নাথের সঙ্গে গিয়েছিলাম লালগোলায় বেড়াতে। জগন্নাথের মাসির মেয়ে বিনতা।

প্রেম ভালবাসা নয়। বিনতার চলন-বলন আমার ভাল লেগেছিল। আমারই মতন গরিব, অভাগা। মা নেই, বাপ আছে। প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার বাপ। সাদামাটা মানুষ।

জগন্নাথ বলল, 'বিয়ে করবি?'

'বিয়ে? তা করলে হয়!' আমি হাসলাম।

'ঠিক বলছিস?'

'আমি ঠিক, যদি ওরা বেঠিক হয়?'

'কথা বলি। মনে হয় হবে না। লেগে যাবে।'

লেগে গেল শেষ পর্যন্ত। বিনতার তখন কুড়ি বছর বয়েস। আমার সঙ্গে তার বয়েসের তফাতটা বেশি। হিসেব করলে প্রায় দশে গিয়ে ঠেকে।

বাসর ফুলশয্যা এসব আমাদের সাজিয়ে গুছিয়ে হয়নি। নমোনমো হয়েছিল। বিনতার বাবা বেঁচে, তিনি যত গরিবই হোন সংস্কার ধর্ম ভাঙবেন কেমন করে।

ওদের মানে বিনতাদের বাড়িতেই উভয় পাট চুকোবার ব্যবস্থা করেছিল জগন্নাথ। কলকাতায় আমি মেসে থাকি, ঘর বাড়ি কই যে ফুলশয্যা হবে! বিনতা এখন বাবার কাছেই থাকবে, সুবিধে মতন সময়ে আমি বিনতাকে নিয়ে যাব।

বিয়ের পর কথায় কথায় বিনতা বলল, 'তোমার নাকি আগের বউ মারা গিয়েছে।

বললাম, হ্যাঁ।' তারপর ঠাট্টার গলায় বললাম, 'আমাদের বংশে ওটাই হয়। প্রথমটা থাকে না। আমার বাবার বেলাতেও···।'

'শ্বশুরমশাই আবার—'

'আমার ছোটমা। সেও আজ নেই।···তা বলে ভেব না, তুমি থাকবে না! তুমি থাকবে।'

বিনতা ছিল একেবারে সাধারণ। মাস্টারের মেয়ে বলে পড়াশোনা শিখেছিল খানিকটা। তার রূপ ছিল না চোখে পড়ার মতন, গায়ের রং ছিল শ্যামলা, মুখের ঢং ছিল বসা, বিষাদ-বিষাদ কেমন এক ভাব ছিল। তবে বড় সুন্দর ছিল তার ঘাড়, গলা, বুক। চোখ দুটি সামান্য বোজা। মনে হত, চোখে যেন ঘুম রয়েছে ওর। আর ছিল একমাথা চুল। কাজেকর্মে পটু ছিল বিনতা। তার চাহিদা বলতে আলাদা করে কিছুই

ছিল না। শুধু চাইত, আমি যেন তাকে তাড়াতাড়ি কলকাতায় নিয়ে যাই।

বিনতা স্বভাবে ধীরস্থির হলেও ভেতরে সে স্বামী-সঙ্গ পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকত। নিজের ঘর, সংসার, নিজের শয্যা, স্বামীর সঙ্গে সহবাস হয়ে থাকত। নিজের ঘর, সংসার, নিজের শয্যা, স্বামীর সঙ্গে সহবাস সবই সে চাইত তীব্রভাবে।

শেষমেশ আমি কলকাতায় এক বাড়ি ভাড়া করে বিনতাকে নিয়ে এলাম।

তোলা উনুন, যৎসামান্য হাঁড়িকুড়ি, হাতাখুন্তি, নিয়ে আমাদের সংসার শুরু হল। শয্যা বলতে একটা পুরনো তেপায়া তক্তপোশ, ভাঙা একটা পায়ের তলায় ইটের ঠেস। সতরঞ্জি, আর সস্তার তোশক চাদর।

পরের বছরই আমাদের প্রথম সন্তান জন্মাল। মেয়ে। নাম রাখা হল, তরু। নামটা তরু হয়ে যাবার ইতিহাস আছে। মজার ইতিহাস। আমাদেয় মেয়ে তরু একেবারে শিশুকাল থেকে ট্যারা ট্যারা চোখে তাকাত। সে কিন্তু সত্যিই ট্যারা ছিল না, তার তাকানোটাই ছিল টের্‌চা ঢঙের। ঠাট্টা করে আমরা তাকে 'টেরু' বলতাম। আদর করে। সেই থেকে হল তরু। ভাল নাম, মীনাক্ষী।

তরু জন্মানোর পর আমরা হলাম এক আট-হাতি ঘরের ভাড়াটে। আট দশ হাতের একটা ঘর, দুটো ছোট ছোট জানলা, কাঠ তোবড়ানো ফাটাফুটো, একটা মামুলি দরজা। দরজা ডিঙোলেই সরু একটু বারান্দা তারপর কাঁচা উঠোন। উঠোনের একপাশে এক চিলতে রান্নাঘর। কল জল কলতলা এজমালি।

আমি তখন জয়চাঁদলালের কম্পানিতে চাকরি করি। খাতাবাবু বলে ডাকতো আমায় জয়চাঁদের ছেলে। মাইনে আর কত! মাস তো দূরের কথা সাতটা দিনও চলত না। বাড়ি ভাড়া গোনার পরও আড়াইটে প্রাণী। টেনে টুনে কষ্ট করে পনেরোটি দিন, তারপর হাত ফাঁকা।

ওই যে আগেই বলেছি, আমার বাড়িঅলা, যার একটা বইয়ের কুটির ছিল—ব্যবসা, এফিডেফিটের কল্যাণে যে পৈতৃক পদবী পালটে সম্ভ্রান্ত হতে চেয়েছিল, সে আমাকে স্কুলের নিচু ক্লাসের বাংলা ইংরেজি বইয়ের মানে লেখাতে জুতে দিল। লেখা যা খুশি হোক, নোংরা কাগজে ছাপা হলেই হল।

তখন আমাদের বড়ই দুর্দিন। ছেঁড়া গন্ধওটা তোশকে শুই, মেয়েটা বিছানা ভিজিয়ে দিলে বিনতার ছেঁড়া ময়লা শাড়ি পাট করে পেতে চাদর করে পেতে নিই বিছানায়, আমাদের মাথার বালিশ তেল চিটচিটে ময়লা। ঘরে আলো ছিল, পাখা ছিল না। গরমের দিন গলগল করে ঘামতাম, হাত পাখার বাতাস দিতাম মেয়েকে।

রোজ সকালে যে চা খেতাম তার যেমন চেহারা, তেমন স্বাদ। ঘোড়ার পেচ্ছাপও বলা যায়। বাজারে যেতাম ময়লা লুঙি পরে, গায়ে ফতুয়া। ঝিঙে, সজনে ডাঁট, কুমড়ো—এই ছিল খাদ্য। শাকপাতা যা জুটত। মাছটাছ ছুঁতে ভয় করত। ছুঁলেও নামমাত্র একটা ডিমে স্বামী-স্ত্রী ভাগাভাগি করতাম।

মানুষ কষ্ট করে। ভগবান আর ক'জনের ভাগ্যে সুখ সমৃদ্ধি লিখেছেন! আমরা তো মাছিমশার তুল্য। বিনতা এসব না বুঝত তা নয়, তবু মাঝে মাঝে সে আর পারত না। মফস্বল থেকে, প্রায় গ্রাম থেকে শহরে এসেছে, স্বামী শহুরে। ভেবেছিল গরিব সংসারেও দিন-চলার মতন ব্যবস্থা থাকবে। উলটে সে দেখতে লাগল, অভাব আর অভাব!

তার ফেঁসে যাওয়া শাড়ি সায়া, সেলাই-করা জামার জন্যে হাত পা ছড়িয়ে সে কাঁদত না বটে কিন্তু তার মুখের চেহারা পালটে যেতে লাগল। মেয়েটার অসুখ বিসুখ করলে হোমিওপ্যাথি খাওয়াতে হত, অ্যালোপ্যাথির পয়সা ছিল না। নিজের স্তনের দুধে তার মেয়ের পেট ভরাত। আমি বুঝতে পারতাম না—যার নিজের শরীর পুষ্টি পায় না—তার স্তনে এত দুধ আসে কেমন করে। দুধ না জল? বিনতাকে

ঠাট্টা করে কথাটা বলেছি বটে, কিন্তু বড় দুঃখেই বলেছি। সে রেগে গিয়ে তার জামা খুলে, বুক দেখাত, বলত 'যাও, গিয়ে পরীক্ষা করে নিয়ে এসো—দুধ, না জল?' ঈশ্বর তাকে কেমন করে যে অমন পরিপুষ্ট দুগ্ধময় স্তন দিয়েছিল কে জানে! আমি যে লোভী হয়ে উঠতাম তাতে সন্দেহ নেই। মুগ্ধ হতাম।

এসব বৃত্তান্ত কত আর বলা যায়! দিনগুলো এমন এক নখ দিয়ে আঁচড়াত যে নিজেদের দারিদ্র্য আর অক্ষমতায় নিজেরাই যেন অপরাধী হয়ে থাকতাম।

টাকা টাকা করে মাথার চুল ছিঁড়েছি—এটা বড় কথা নয়, বড় কথা আমাদের বাড়ি, দেওয়াল, বিছানা, ভাঙা ট্রাঙ্ক, মিটশেফ থেকে অভাবের এমন দুর্গন্ধ উঠছিল—মনে হত মেয়েটার বমি সর্বত্র শুকিয়ে গিয়ে পচা এক গন্ধ উঠছে। বিনতার সঙ্গে আমার রাগারাগি ঝগড়া হত বিছানায় শুয়ে সে আমার মৃত্যুকামনা করুক না করুক—এক একসময় আমার মনে হত, বিনতা আমাকে মুক্তি দিক। না, আমি তার মৃত্যু-কামনা করিনি। জীবনে কখনো কারও নয়। আমি যা যা ঘৃণা করেছি সারাজীবন তা হল, অন্যের মৃত্যুকামনা আর দুঃখী মানুষকে আঘাত করা।

কিন্তু জীবন তো তার নিয়মে চলে। এই বিনতাই আবার এক একসময় আমার দেহমনের নিবিড়তম স্থানে যেন একমাত্র আপন বলে মনে হত।

একবার আচমকা হাতে টাকা এসে গেল শ'খানেক। প্রথমেই মনে হল, মেয়ের জন্যে জামা ইজের কিনবো, বিনতার জন্যে শাড়ি জামা। বিনতাকে কাঁচা হলুদশাড়িতে বড় ভাল দেখাত। খুঁজে খুঁজে তার শাড়ি কিনলাম, মেয়ের জন্যে ফুল ফুল জামা, ইজের। কিনে বাড়ি ফিরব, মুখে আমার পান-জরদা—এমন সময় কালবৈশাখী উঠল। আর এমনই কপাল সুবোধ পালিতের সঙ্গে দেখা। দুজনেই এক দোকানের মধ্যে দাঁড়িয়ে ধুলোর ঝড় বাঁচাচ্ছি। সুবোধ শালা নিত্যদিনের

নেশাখোর। বলল, 'চলো রাজা, হয়ে যাক একটু। স্মল ডোজ। আমার পিতৃবিয়োগ হবে আজকালের মধ্যেই। দুঃখটা সামলাবার মুড করে নিই।'

ঝড় থামার পর বৃষ্টি নামল। সুবোধ আর আমি বেলগেছের ঘাঁটিতে গেলাম।

যখন বাড়ি ফিরলাম আমার হাতে না শাড়ি না মেয়ের জামা। ভুলে ফেলে এসেছি।

বিনতা সেদিন আমায় যা যা বলেছিল মনে আছে। আমি মিথ্যেবাদী, নেশুড়ে, জোচ্চোর, লোচ্চা। বাপ হবার যোগ্য নই। স্বামী হওয়াও আমায় মানায় না। আমার উচিত ছিল, ছটফটের সময় বেশ্যাবাড়ি যাওয়া।

সেদিন আমি বিনতার গায়ে হাত তুলেছিলাম। বিনতাও আমায় রেহাই দেয়নি।

পরের দিন গেলাম ফেলে আসা জিনিসগুলো খুঁজতে।

পেলাম না। কে কখন নিয়ে চলে গেছে।

ঈশ্বর সাক্ষী, আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তারপর কতদিন মনে মনে বিনতার হলুদ শাড়িটার কথা ভেবেছি।

এই ধরনের মন-মেজাজ নিয়ে বেঁচে আছি যখন তখন অন্তু এল বিনতার পেটে।

আর অন্তুর জন্মের পর পর আমার জীবনে এল বন্ধু নলিনাক্ষ। তারপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। পায়ের তলায় মাটি হল, মাটির পর সিঁড়ি। ধাপে ধাপে আমার জীবন পালটাতে লাগল।

তরুকে নিয়ে আমার চিন্তা হয়নি। সে বড় হল, কিশোরী হল, তরুণী হল। আমার তখন ভালই অবস্থা।

তরু তখন কলেজে পড়ে। বছর উনিশ বয়েস। তার মাথা তেমন পরিষ্কার ছিল না। শখের পড়া পড়তে যেত। ওর ওপরের স্বভাব

ছিল হাল্কা ; ভেতরে ভয়ঙ্কর জেদ। মায়ের সঙ্গে তার বনিবনা হত না। বিনতা চাইত, মেয়েকে আগলে রাখতে, নজরে নজরে রাখতে।

তরু ভাবত, তার মা শুধু সেকেলে নয়, বোধবুদ্ধিহীন। মা মেয়েকে ঘরের ভেতর আটকে রাখতে চায়।

আমাদের অতি দুর্দিন যখন গিয়েছে তরু তখন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছিল। আমি জানি না, তার ছেলেবেলার মন আমার আর বিনতার দাম্পত্য জীবন দেখে দেখে ভেতরে ভেতরে বিরক্ত ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছিল কি না! অন্তত সে যে আদর্শ দম্পতি হিসেবে আমাদের গ্রহণ করেনি —এটা ঠিকই। নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন যে গোলাপ বাগান নয় মনে মনে সে জেনে ফেলেছিল বোধ হয়। বা তার শিশুমনের কোথাও কিছু কাঁটা বিঁধে গিয়েছিল।

তরু দেখতে মাঝারি ছিল গড়নে রোগা। বয়েস বেড়ে যাবার পর তার হাতে গায়ে চাকচিক্য এসেছিল। কথা সে বলত রুক্ষ করে নয়, রাগ-বিরক্তি নিয়েও নয়। কিন্তু তার ঘাড় ঘোরানো, তার স্থির চোখ বুঝিয়ে দিত সে কতটা জেদি, একগুঁয়ে।

বিনতা ঠিক করেছিল, আর এক আধ বছরের মধ্যে সে তরুর বিয়ে দেবে। আলগা আলগা কথাও শুরু করেছিল।

এরপর কী যে হল, আমিও জানলাম না। কল্পনাও করিনি। একদিন সকালে উঠে দেখা গেল তরুর ঘর ভেজানো, অন্তু তার নিচের খাটে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। তরু নেই।

যাবার আগে তরু একটা চিঠিতে লিখে গিয়েছে, সে তার পছন্দ মতন ছেলের সঙ্গে এরনাকুলাম চলে যাচ্ছে। ছেলেটিকে সে বিয়ে করেছে। এখন থেকে সে তার স্ত্রী। তোমরা অকারণ হইচই করো না। আমি নিজের পছন্দমতন ছেলেকে বিয়ে করেছি। সে আমায় তাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা আমায় ফেলে দেবে না। আমার পিছনে তাড়া করো না আমি পরে তোমাদের চিঠি লিখে খোঁজখবর নেব।

বিনতা চিঠি হাতে বসে থাকল পাথরের মতন। দু চোখ বেয়ে জল াড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি স্তব্ধ। অন্তু ঘরের কোণে মুখ গুঁজে সে থাকল। সেও তো বড় হয়েছে।....তবে আশ্চর্যের কথা, বিনতার তটা আকুল হবার কথা ছিল, পাগল হয়ে পড়াই স্বাভাবিক ছিল—বিনতা ততটা ব্যাকুল হল না। জানি না অভিমানে, না আত্মমর্যাদার শে। ....হ্যাঁ, মেয়ের কথা বলত বিনতা আমার পাশে বিছানায় শুয়ে য়ে, চাপা গলায়, কখনো স্বগতোক্তির মতন, কখনো বা ঘুমের মধ্যে থা বলার মতন।

দিনগুলো এইভাবেই কাটতে লাগল।

তরু চিঠি দিত। তার মা দু একটির বেশি চিঠির জবাব দেয়নি। আমি বরং জবাব লিখেছি।

বাচ্চা হল তরুর। ছবি পাঠাল।

শেষে ওরা একদিন দেশ ছেড়ে চলে গেল বিদেশে। দুবাই।

মেয়ের খবর প্রথমে পেয়েছিলাম। পরে জানলাম, গাড়ি উলটে ারা গিয়েছে।

এখানেই শেষ হয়ে গেল তরুর কথা। ছবিতেই তার বাচ্চাকে, তাকে আর তার স্বামীকে দেখেছি, তরু কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার পর চাখে কোনোদিন আর দেখা হল না।

সময় তো কেটেই যাচ্ছিল। ঘোরানো, গড়ানো চাকা—কবে আর থেমে থাকে। নলিনাক্ষ চলে গেল একদিন। বিনতাও।

বিনতার এত তাড়াতাড়ি যাবার কথা ছিল না। বরং আমিই যেতে পারতাম। গেল বিনতা। অনেক দুঃখ কষ্ট সয়ে, অভাব দারিদ্র্যতে ক্ষয় হয়ে যখন সে সুদিন হাতে পেল। গুছিয়ে নিচ্ছিল ক্রমশ। তার চেহারায় বয়েস এসে ধরা দিয়ে তাকে প্রবীণা করে তুলছিল, মুখে হাসি, চোখে তৃপ্তি দেখা যাচ্ছিল তখনই সে একদিন সন্ধেবেলায় প্রচণ্ড মাথা ব্যথা নিয়ে ছটফট করতে লাগল, কাঁদতে লাগল বাচ্চার মতন। দু চার

ঘণ্টা পরেই তার সেরিব্রাল অ্যাটকটা ধরা পড়ল।

সকালের আলো ফোটার আগে বিনতা বিদায় নিল।

আমার সেদিন মনে হয়েছিল, জীবন আমার শূন্য হয়ে গেল, বিনু আমার মধ্যে সুখদুঃখ বেদনা আনন্দ আশা আকাঙ্খা দিয়ে যে ভরাট ভাব সৃষ্টি করেছিল, তা আর রইল না। আমি ফাঁকা হয়ে গেলাম।

॥ সাত ॥

এ-বাড়িতে সকাল শুরু হয় সূর্য ওঠার আগে আগেই। 'পাখি সব করে রব'-এর মতনই। ইন্দিরা উঠে পড়ে, যিশুকে জাগায়। মায়েতে ছেলেতে ধস্তাধস্তি। রান্নাঘর, স্নানঘর। জামা-প্যাণ্ট জুতো। দুটো মুখে গোঁজা, ওয়াটার বটল, টিফিন। স্কুলের বাস ধরতে মায়েতে ছেলেতে ছোটা। ছেলেকে বাসে তুলে মা ফিরে আসে। প্রথমে যায় যিশু। তারপর পালা চলে অন্তর। অন্তু বরাবরই ঘুম-কাতুরে। তাকে যে ঠেলেঠুলে তোলে ইন্দিরা, গজগজ করে তা আমি বুঝতে পারি।। অন্তু বিছানা ছেড়ে উঠল তো চায়ের কাপ মুখে তুলতে না তুলতেই তার সাজো সাজো রব শুরু হয়ে গেল। তার অফিস সাড়ে ন'টায়। চার্টার্ড বাসে যায়। ন'টার আগেই বকুলতলার মোড়ে বাস এসে থামবে। দু এক মিনিট এদিক ওদিক। অন্তু যাবার আগে একবার আমার খোঁজ খবর করে যায়। তারপর ইন্দিরা পালা। ইন্দিরার বেরুতে বেরুতে দশটা বাজে। তাঁর স্কুল দূরে নয়। বাসে আধ ঘণ্টার মতন।

দশটার পর এ-বাড়ি ফাঁকা। আমি আর ছায়া। এখন অবশ্য-আমাকে দেখাশোনার জন্যে মহেশ আছে। মহেশ লোকটি নিরীহ, খানিকটা জবুথুবু গোছের। মাথায় চট করে কিছু ঢোকে না। তবে ভাল লোক। আমাকে সে নজরে নজরেই রাখে।

ছায়া বাড়ির কাজকর্ম সারে। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। জল দেয়, চা দেয়, ওষুধও দিতে জানে। দু পাঁচটা গল্পও করে।

দুপুর থেকে বাড়িটা একেবারে নিঝুম। চুপচাপ শুয়ে থাকলে—কাকের ডাক, চড়ুইয়ের ফড়ফড়, সাইকেল রিকশার আওয়াজ, প্লেন চলে যাবার শব্দ, কখনো কখনো গাছপালার পাতার শব্দও শোনা যায়। আর এখন হঠাৎ হঠাৎ কোকিলের ডাক কানে আসতে শুরু করেছে। শীতও কি শেষ হল? এসে গেল বসন্ত!

দৃষ্টি যখন থাকে না—তখন আমার নড়াচড়াও কমে যায়। নিজের ঘর, বিছানা, বাইরের বারান্দা আর বাথরুম। শরীর জুড়ে অদ্ভুত এক বিরক্তিকর জড়তা আসে। শুধু মন কোথা থেকে কোথায় চলে যায়, ডুবে যায় নিজের অতীতে। আমি কেমন মন-ডুবুরি হয়ে বসে থাকি।

সেদিন যখন ইন্দিরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার আগে আমার ঘরে এসে বলল, 'বাবা, আমি আসি—' তখনও চক্ষু দৃষ্টিহীন ছিল। ও চলে যাবার পর, ছায়া এক কাপ চা এনে দিল। মহেশ গেল নাপিত ডেকে আনতে। আমাদের পাড়ার চুনো বাজারে এক সুবল নাপিত বসে। গাছতলায় এক চেয়ার পেতে, মাথার ওপর প্লাস্টিকের কাপড় টাঙিয়ে সেলুন দিয়েছে সে। নাম তার সুবল হলেও লোকে তাকে মাস্টার বলে ডাকে। সুবল নাকি কইখালিতে যাত্রা দলের অভিনেতা। যখন আমার দৃষ্টি থাকে না তখন সুবল এসে আমার দাড়ি কামিয়ে দিয়ে যায়। রোজ সে আসতে পারে না। একদিন অন্তর আসে।

সুবল এসে আমার দাড়ি কামাতে বসেছিল। ছায়া আমার দাড়ি কামানো সাবান, ব্রাশ, ডেটল-জল বার করে দিয়েছে। এমনকি রেজার। সেলুনে যেভাবে ব্লেড লাগিয়ে রেজার দিয়ে দাড়ি কামানোর চল হয়েছে আজকাল, সুবলও সেইভাবে আমার দাড়ি কামিয়ে দেয়।

সুবলের দাড়ি-কামানো শেষ হয়ে এসেছিল। আমি

'হেমারোলোপিয়া' বলে এক অদ্ভুদ রোগের কথা ভাবছিলাম। অন্তু গতকাল বলছিল, কে নাকি তাকে বলেছে, আমার অসুখটা বোধ হয় এ কেস অফ অ্যাবনরম্যাল হেমারোলোপিয়া বা ওই জাতের। এই অসুখে নাকি দিনকানা হওয়া সম্ভব, তবে রাত্রে মোটামুটি দেখা যায়। অর্থাৎ রাতকানার উলটো ব্যাপার। তবে যেহেতু আমার অন্ধত্বে দিন বা রাত নেই, যখন দৃষ্টি যায়, দিন রাত ভেদাভেদ করে না—তখন বাধ্য হয়েই একে অ্যাবনরম্যাল বলতে হচ্ছে।

এসব যুক্তি, নাম আমার মাথায় আসে না। ভালও লাগে না শুনতে। আমি এই মাত্র বুঝি যে, যখন আমার দৃষ্টি থাকে না—তখন আমি মনের মধ্যে কত কিছু যেন হাতড়ে বেড়াই। এখন এসেছে কমলা।

কথাটা মনে এল, ঘোরাফেরা করল, উড়ে গেল—গিয়েই দেখি আবার সেই কমলা—কমলা। তার অস্পষ্ট মুখ···।

আর ঠিক এই সময় আমার মনে হল, মোটা ঘষা কাচের বাইরে ছায়া ছায়া কিছু নড়াচড়া করলে যেমন দেখায় সেই রকম ছায়া নড়াচড়া করল।

সামান্য পরে ঘষা কাচ পাতলা হতে লাগল। স্পষ্ট হতে লাগল ছায়াগুলো।

আমি তাকিয়ে থাকলাম।

ক্রমশ, অতি ধীরে ধীরে যেন কাচ স্বচ্ছ হতে হতে আমার দৃষ্টির সামনে, সুবল আর মহেশ ধরা পড়ল।

হ্যাঁ, আমি ওদের দেখতে পেলাম।

"মহেশ ?"

"বাবু !"

"কাছে এসো তো !"

মহেশ কাছে এল !

ওকে দেখলাম। খোঁচা খোঁচা চুল মাথায়। কপালে একটা

খোঁড়ার মতন হয়েছে। গাল বসা। গলায় কণ্ঠি। গায়ে এক খাটো জামা।

সুবলকেও দেখলাম।

আমার দৃষ্টি ফিরে এসেছে আবার। বারান্দায় বসে দাড়ি কামাচ্ছিলম। চোখের সামনে সবই ফুটে উঠল। লোহার গ্রিল, নিচে পাতাবাহারের গাছ, টবে বসানো গোলাপ, গেটের কাছে পাতা ঝরা শিউলি গাছ। রোদ চড়েছে। কৃষ্ণচূড়া গাছটায় ফুল আসার সময় হল নাকি? রাস্তা দিয়ে সিমেণ্টের বস্তা নিয়ে এক ঠেলা চলেছে গড়িয়ে গড়িয়ে।

"বাবু?"

"ছায়াকে ডাকো, পয়সাটা দিয়ে দাও সুবলকে।" বলে আমি উঠে দাঁড়াচ্ছিলাম। দাঁড়ালাম না।

ছায়া এল, পয়সা দিল সুবলকে।

সুবল চলে গেল। পরনে পাজামা, গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি।

"ছায়া?"

"বাবা?"

"আমি আবার দেখতে পাচ্ছি রে—" বলতে বলতে গলা আমার ভরে উঠল।

ছায়া প্রথমটায় বিশ্বাস করল না। "সত্যি বাবা?"

"হ্যাঁরে—! দেখতে পাচ্ছি।…তুই কী রঙের শাড়ি পরেছিস, বলবো? খয়েরি রঙের। ছাপা শাড়ি? তোর হাতে সাবানের ফেনা নাকি? কাপড় কাচছিলি?"

ছায়া হাসিমুখে ছেলেমানুষের মতন বলল, "হ্যাঁ বাবা!" বলে মহেশের দিকে তাকাল। "মহেশদা, বাবার চোখ এসেছে।"

মহেশও বুঝতে পেরেছিল। বলল, "আমার মন বলছিল বাবু-র চোখ আসবে। ভাল হল।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম। নিজের মতন করে বারান্দায় হাঁটলাম

সামান্য। বারান্দার মোজেইক দেখলাম। চমৎকার দেখতে পাচ্ছি। তারপর বললাম, "মহেশ, এবার ক'দিন হল বলতে পার ?"

মহেশ একটা হিসেব করতে যাচ্ছিল, তার আগেই ছায়া বলল, "আজ আঠারো দিন।" ···ছায়া কেমন করে হিসেবটা মনে রেখেছিল কে জানে—আমি অত সঠিক করে বলতে পারতাম না। বরং আমার মনে হচ্ছিল, এবার বুঝি বেশি ভোগাচ্ছে। একটু তাড়াতাড়ি কেন ফিরে আসছে না আমার দৃষ্টিশক্তি ? কেন নয় ? আমি যে এর আগে দু-তিন এমনকি মাসখানেক অন্ধ হয়ে থেকেছি তা জেনেও এবার আমার মধ্যে কেমন এক ব্যাকুলতা আর উৎকণ্ঠা দেখা দিচ্ছিল। কেন ?

কমলার জন্যে ?

আমি জানি এ-কথা বলার আজ কোনো অর্থ হয় না। তিন যুগ আগে যা ঘটে গিয়েছে, যার সঙ্গে আমার জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই আর সেই পর্বটার জন্যে আমার ব্যাকুল হবার কোনো কারণ থাকা উচিত নয়। তবু হচ্ছিলাম। কেন তা আমি জানি না। মানুষের মনের বিচিত্র স্বভাব কেই বা বোঝে ! সেই যে খুশি—আমার বাল্যসখী, যে আমায় অত ভালবাসত সে আমায় কেন অমন করে মেরেছিল চোখের ওপর কেউ কি বলতে পারে ? আমার ছোট-মা যে মানুষ আমায় বুকে-করে তুলে নিয়েছিল সেই মা কেন আমায় তার হৃদয় থেকে খানিকটা তফাত করে দিল শেষে ? কে বলবে, জিনজি আমায় যে 'আরে শালে' ছাড়া ডাকত না, কেন আমায় তার জীবনের চৌহদ্দি থেকে হটিয়ে দিল ? কী জন্যে আমি চিন্তামণি বউদিকে ছাদে অন্ধকারে নক্ষত্রের আলোয় নির্বাসনা দেখার পরও পিছু হটে আসিনি ? এই রকম আরও কত আছে ? সারাজীবন ধরেই। আমার মেয়ে তরু কেন চলে গেল অমন করে ? কেন সে আমাকে অবিশ্বাস আর ঘৃণা করল ? বিনু—যে আমার অতশত জানত সে কেন একদিন আমায় বলেছিল, 'তুমি যে কত পাপ করে গেলে জীবনে, জানলে না। তোমায় সারাজীবন কাঁদতে হবে। চোখে নয়, মনে মনে !' কোন পাপ আমি

করেছিলাম বিনু—যা সাধারণ মানুষ করে না?

কেন জগতটা হল, কেন আমি তুমি হলাম—এই সব অর্থহীন প্রশ্নের মতন শত প্রশ্ন জীবনে থেকে যায়! তার উত্তর পাওয়া যায় না।

বিকেল থেকে বাড়িতে চমক লাগার পালা।

যিশু আসবে বলে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম দুপুরে। ছায়া তাকে নিয়ে এল মোড় থেকে, স্কুল-বাস ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়, ছায়া নিয়ে আসে মোড় থেকে।

ছায়া বোধ হয় ওকে আগেই খবরটা দিয়েছিল, গেট খুলে ছুটতে ছুটতে এল যিশু। এসেই বলল, "দাদা, আমার ফিঙ্গার বলো? ক'টা ফিঙ্গার?" বলে তার ডান হাত মাথার ওপর তুলে ধরল।

হেসে বললাম, "নো ফিঙ্গার। হাত মুঠো করে আছিস!"

যিশু প্রায় ছাগলছানার মতন ছুটে এসে আমায় গুতো মারল। "তুমি ভীষণ চালাক।"

বিকেলে এল ইন্দিরা।

"বাবা, আপনি আবার ভাল হয়ে গেছেন শুনলাম!"

আমি হাসলাম। "এই ভাল, আবার মন্দ—এই তো চলছে।"

"তা হোক। তবু তো আপনি ভালই বেশি থাকছেন।"

"তা থাকছি।"

"এবার থেকে এক কাজ করবেন। বাড়ির কাছাকাছি ছাড়া একলা কোথাও যাবেন না। একজন সঙ্গে থাকলে ভাল। আপনিও সাহস পাবেন, আমরাও অনেকটা নিশ্চিন্ত হব।"

ওর দিকে মুহূর্তকয় তাকিয়ে থাকলাম। "দেখি।"

অন্তর ফিরতে ফিরতে সন্ধে।

সে ফিরে এসে দেখল, আমি নাতির সঙ্গে গল্প করছি—হাসি হাসি মুখে।

ঝিশুই খবরটা দিল।

অন্তু স্বস্তির বড় এক নিশ্বাস ফেলে বলল, "বাঃ! .. তুমি একদিন ভাল হয়ে যাবে, বাবা! আমি বলছি। ডাক্তারদের কথা আমি আর বিশ্বাস করি না। ওরা যার যা মনে হয় বলে!"

আমি কিছুই বললাম না। হাসলাম।

খেতে বসেছি, ইন্দিরা বলল অন্তুকে, "মহেশকে বাবার জন্যে রেখে দাও।"

রেখে দাও! কেন? আমি বললাম, "দরকারের সময় তো মহেশ থাকেই, তাকে রেখে দেবার দরকারটা কিসের!"

"আপনি বাইরে গেলে সঙ্গে থাকবে।"

অন্তু খেতে খেতে বলল, "গুড আইডিয়া"

আমি বললাম, "একটা লোককে সব সময় পাশে নিয়ে ঘোরা ভাল নয়। নিজের ওপর কনফিডেন্স হারিয়ে যায়।"

"সব সময় কেন হবে, আপনি যখন বাইরে কোথাও যাবেন তখন ও সঙ্গে থাকবে।"

"বাইরে আমি কতটুকু যাই বউমা। তাছাড়া, একটা লোককে রাখতে হলে পার্মানেণ্টলি রাখতে হয়। খরচপত্র রয়েছে।"

অন্তু বলল, "ঠিক আছে। মহেশের সঙ্গে আমি কথা বলব।"

রাত্রে ঘুমের মধ্যে কেন যে কমলা আমার স্বপ্ন জুড়ে থাকল জানি না। তাকে নানাভাবে দেখলাম। কখনো তার সেই পুরনো গলির বাড়িতে, কখনো সুমতিদের বাড়িতে, কখনো নিয়োগী লেনের ঘরে দরজায় উঠোনে। কমলা চুল বাঁধছে, কমলা স্নানশেষে ভিজে শাড়ি মেলে দিচ্ছে রেলিংয়ে, কমলা বসে বসে তরকারি কুটছে, সে শুয়ে আছে, তার সঙ্গে একই রিকশায় বসে আমি কোথায় যেন চলেছি, দেওয়ালির দিন মোমবাতি জ্বালাচ্ছে কমলা, কখনো দেখি সে আমার কোলে

আধাআধি বসে গলা জড়িয়ে হাসছে, আবার সে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে।

ঘুম ভাঙল ভোরে।

কমলা নেই। কিন্তু সে আমার মন যে কী এক হাহাকারে ভরিয়ে রেখে গেছে কেমন করে বলব!

সকালে বাড়ির সামনে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ আমার মনে হল, আমি কি একবার কমলার খোঁজ করতে যেতে পারি না?

অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। কোন্ ঘর? কার ঘর? কমলার ঘর তো আমার নয়। হয়ত রজনীর? না অন্য কারুর! আমার কী স্বার্থ খোঁজ করার! তাছাড়া এতদিন হয়ে গেল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পর কমলা কি বেঁচে আছে? নাকি কোথাও গিয়ে আত্মহত্যা করেছে? গাড়ি চাপাও তো পড়তে পারে। বা ঝাঁপ দিতে পারে গঙ্গায়। কোথায় খোঁজ করব কমলার।

কমলা কোথায় হারিয়ে গেল? নিরুদ্দেশ হল কেন? কেন?

॥ আট ॥

আমাদের বাড়ি থেকে খানিকটা এগিয়ে শাসমলদের দোকান। ওরা স্যানিটারি ফিটিংস বিক্রি করে। শাসমলদের একটি ছেলে নৃপেন আমায় মেসোমশাই বলে ডাকে। মান্য করে। ওদের দোকান শুরু আর আমার বাড়ি শুরু প্রায় একই সময়ে। মালপত্র দিয়েছিল আমাকে। সেই থেকে খাতির।

ওদের ওখান থেকেই আমি চুনি সরকারকে ফোন করলাম।

অন্যে শুনলে বলবে আমি পাগলামি করছি! আমার নিজেরও মনে হয়, ব্যাপারটা পাগলামি। তবু, এই পাগলামি যে আমায় কেন

পেয়ে বসল আমি জানি না।

দৃষ্টি ফিরে পাবার পর দুটো দিনও আমি বাড়িতে বসে থাকলাম না। বাইরে আসা-যাওয়া শুরু হল। মহেশ থাকল আমার সঙ্গে। অকারণে। ইন্দিরা আর অন্তর ধারণা,এত তাড়াতাড়ি আমাকে একা বাইরে ঘোরাফেরা করতে না দেওয়াই ভাল। অকারণে বাবুদের মতন নকর নিয়ে ঘুরে বেড়াতে আমার ভাল লাগত না। কিন্তু মহেশকে যদি ওরা আমার সঙ্গে এভাবে জুড়ে দেয় কী করব।

তখন মাঝ-বিকেল। মহেশ আমার সঙ্গেই ছিল। শাসমলদের দোকানের সামনে গিয়ে মহেশকে বললাম, "তুমি একটু ঘোরাফেরা করো কাছেই ; আমি একবার দোকানে যাব।"

নৃপেন দোকানেই ছিল। গদিতে বসে ছিল। কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলছিল।

দু-একটা সাধারণ কথার পর ইতস্তত করে বললাম, "একটা ফোন করব।"

নৃপেন বলল, "পাশের ঘর থেকে করুন, মেসোমশাই। এই ফোনটায় কথা বলতে পারবেন না, কিসের যে খরখর শব্দ করছে।"

পাশে অফিস-ঘর। ফাঁকাই ছিল।

অফিস-ঘর থেকে ফোন করলাম চুনি সরকারকে। ঘরে কেউ ছিল না।

চুনিকে পাওয়া যাবে ভাবিনি। পেয়ে গেলাম।

আমার গলা শুনে প্রথমটায় ধরতে পারেনি চুনি, নাম বলতেই যেন খুশিতে ফেটে পড়ল। "বিশুদা! ওরে বাব্বা, এতকাল পরে?"

"এতকাল কোথায় হে! গত বছরও তোমার সঙ্গে দেখা হল!"

"গত বছর আর এ বছর! দাদা, এক বছরে কত কী ঘটে যায়।"

"তোমার কী ঘটল?"

"মা চলে গেছেন। কেন আপনি কি চিঠি পাননি? কাজের সময় চিঠি পাঠিয়েছিলাম। হ্যাঁ আমার খেয়াল আছে।"

"কই না···তোমার মা চলে গেছেন খবর পেলে একবার নিশ্চয় যেতাম।"

"তা জানি। ভাবলাম কী জানি। যা দিনকাল পড়েছে কারুর খোঁজ নিতে ভয় হয়। চিঠিরও আজকাল যা দশা। পৌঁছবে কি পৌঁছবে না বলা যায় না।···তা আপনি কেমন আছেন?

"মোটামুটি। ওই চোখটাই যা—তোমায় কি বলেছিলাম সেবার?"

"বলেছিলেন। এখন ভাল তো?"

"হ্যাঁ—তা ভাল।" দু তিন দিন আগেও যে আমি চোখের গোলমালে ভুগেছি তা আর বললাম না ওকে। "তুমি নিজে কেমন আছ চুনি?"

"ভাল নয়, দাদা। মা গেলেন, তারপর আমার হল জণ্ডিস। অম্লের ওপর দিয়ে গেছে। এদিকে গিন্নির সেই একই ব্যাপার—অ্যাজমা।"

"রোগভোগ বাদ দিয়ে এখন আর বাঁচা যায় না, চুনি। সব সংসারেই এক ব্যাপার। একটা না একটা লেগেই আছে।"

"যা বলেছেন।···হঠাৎ আপনি আমায় মনে করলেন?"

"তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।"

"বলুন।"

"তুমি তো দমদমের পুরনো বাসিন্দে।···আমি একজনের খোঁজ চাইছি।

—কে?

—কে? চুনিকে কী বলব? আমি কি তাকে বলব, আমি যার খোঁজ করছি—সে আমার প্রথমা স্ত্রী ছিল? না, তা বলা যায় না।

"আমার এক আত্মীয়ার খোঁজ করছিলাম। নাম কমলা দেবী।"

"কমলা দেবী।···দমদমে থাকতেন। দমদম তো বড় জায়গা দাদা! কোথায় থাকেন? ঘুঘুডাঙা, হনুমান মন্দির, ক্যাণ্টনমেণ্ট, না

নাগের বাজারের দিকে! লোকে সবই তো দমদম বলে, গান শেল ফ্যাক্টরি পর্যন্ত। জায়গাটা বলুন! লোকালিটি?"

লোকালিটি? কোন জায়গায় থাকত কমলা?

আমি চুপ। মনে পড়ল না কিছুই। নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণার সময় নিশ্চয় কিছু বলেছিল। জায়গার নাম, গলির নাম বা অন্য কিছু। আমি খেয়াল করে শুনিনি। অথবা কানে শুনলেও মাথায় ঢোকেনি। ছবি দেখতে দেখতে, নাম শুনতে শুনতে বোধ হয় মনোযোগ দিতে পারিনি। সত্যি তো! কে কমলা? দমদমের কোথায় থাকে? কোন এলাকায়?

"হ্যালো—।"

চুনি ভেবেছিল লাইন কেটে গিয়েছে বলে সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।"

আমি সাড়া দিলাম। "ইয়ে মানে—আমি ঠিক জানি না চুনি। জায়গাটা জানি না।"

জায়গা জানেন না? পাড়া?" চুনির গলা শুনে মনে হল সে বেশ অবাক। "একটা ঠিকানা।"

"জানি না।"

"স্বামীর নাম? কী করেন।"

"স্বামীর নাম—।" আমার মাথায় কিছু আসছিল না। কমলা কি রজনীর স্ত্রী ছিল? রজনী কি···

"একটা অ্যাড্রেস দিলে খোঁজ করতে পারি।" চুনি বলল।

সামান্য চুপ করে থেকে আমি বললাম, "ঠিকানা জানি না, চুনি মানে আমার মনে পড়ছে না। স্বামীর নাম বোধ হয় রজনী...."

"না দাদা, আমি তো রজনী বলে কাউকে চিনি না। আমাদের পাড়ায় অন্তত রজনী বলে কেউ আছে বলে মনে করতে পারছি না। তবে আশেপাশে থাকতে পারে। সবাইকে তো চেনা সম্ভব নয়। যদি তেমন জরুরি হয় একবার খোঁজ করতে পারি। আপনি পরে কোন

করুন, দেখি...”

ফোনটা আমি রেখে দিতেই যাচ্ছিলাম। ভীষণ বোকামি হয়ে গিয়েছে চুনিকে ফোন করে! হঠাৎ মনে হল, বললাম, “একটা কথা চুনি। কমলা কিছুদিন আগে বাড়ি থেকে চলে গেছে। মাথার গোলমাল হয়েছিল। কী জানি—এক কাপড়ে বেরিয়ে গেছে বোধ হয়। গাঁয়ে সামান্য গয়নাগাঁটি ছিল।”

“সে কী! পাগল অবস্থায়...”

“একে মেয়ে, বয়েস হয়েছে, মাথার গোলমাল, গায়ে অন্তত দু-চার ভরি গয়নাগাঁটি; বুঝতেই পারছ এই কলকাতা শহরে...”

“কত বয়েস?”

কত বয়েস কমলার? কত হয়েছে এখন? মনে মনে হিসেব করলাম। বিনতার চেয়ে বড়ই ছিল। কমলার এখন ষাটের কাছাকাছি বয়েস হবার কথা। বললাম, “তা ধরো প্রায় ষাট।”

“ষাট! সে তো বুড়ি। এই বয়সে ঘর ছেড়ে চলে গেছে ...বিপদের কথা দাদা। তবে অন্য ভয় না থাক—গয়নাগাঁটি জন্যে খুনটুন হতে পারে। তা বুড়ির স্বামী, ছেলেমেয়ে? তারা? তারা কী করছে?”

আমি চুপ। কী জবাব দেব। চুনি ঠিকই বলেছে, যাদের নিজেদের লোক পাগল হয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছে—তারা কী করছে?

“আমি কিছুই জানি না চুনি”, আমি বললাম নিচু গলায়, কুণ্ঠার সঙ্গে। “তোমায় আমি কিছুই বলতে পারবনা। কিছুদিন আগে তোমাদের টেলিভিসনে হঠাৎ দেখলাম। ওই যে মিসিং পারসনদের সম্পর্কে জানায়-টানায়— তাতেই আমি জানলাম।

চুনি যেন হতাশার শব্দ করল। বলল, “তাই বলুন। কিন্তু এ অসম্ভব ব্যাপার, বিশুদা। ময়দানে ছুঁচ খুঁজে বার করায় চেয়েও কঠিন। আপনি পারটিকিউলার কিছুই জানেন না, কেমন করে তার

খোঁজ করবেন। এ ব্যাপারে পুলিশ ছাড়া উপায় নেই। লালবাজারে খোঁজ করুন না। কতদিন হল মিসিং?"

কতদিন? হিসেব করলাম। "সপ্তাহ তিন—।"

"তিন হপ্তা।…এত দিন পর—। সরি বিশুদা, আমি তো কোন আশা দেখছি না। তবে বাড়ি-টাড়ির নম্বর, পাড়া জানলে একটা চেষ্টা করতে পারতাম।"

নিজের বোকামির জন্যে লজ্জাই করছিল। অকারণ চুনিকে ফোন করলাম। তার কোন দোষ নেই, সে কী করতে পারে আর, আমিই তো কমলার কোন বৃত্তান্তই জানি না।

দু চারটে অন্য কথা বলে ফোন রেখে দিলাম।

সন্ধেবেলায় ছে'চল্লিশ নম্বর বাড়ির মেয়েরা বেড়াতে এসেছিল ওরা পুরোপুরি বাঙালি নয় শুনি, জগদীশ খান্না। তবে তিন পুরুষ থেকে বাংলাদেশে থাকতে থাকতে বাঙালির বাড়া হয়ে গিয়েছে। ও বাড়ির এক মেয়ে—ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছে কিছুদিন আগে, অঘ্রানের শেষে, সেই মেয়ে এসেছে বাপের বাড়ি ক'মাস পর; মেয়েকে নিয়ে তার মা আর দিদি এসেছে বেড়াতে। বসার ঘরে গল্পগুজবের আসর বসেছে জমাট। অন্তু গিয়েছে ব্লক কমিটির কিসের মিটিংয়ে। ধরে নিয়ে গিয়েছে শোভনদের বাড়ি। নাতিটা কিছুক্ষণ আমায় জ্বালিয়ে বড়দের আড্ডায় গিয়ে ভিড়েছে।

শীত ফুরিয়ে গেলেও এখনো তার ছোঁয়া আছে। রাত্রের দিকে বেশ গা সিরসির করে। মশাও এত বেড়েছে এবার।

নিজের ঘরে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কানে এল বসার ঘর থেকে গান ভেসে আসছে। হই রই ব্যাপার।

ও! ওরা টেলিভিশন খুলেছে। নাচগান হচ্ছে একটু…। হিন্দিটিন্দি হবে…।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল, আচ্ছা—টেলিভিসনে 'হারানো

লোকেদের' খবরটবর ক'দিন ধরে বলে? দু একদিন? নাকি একবার মাত্র? অথবা সপ্তাহভর।

আমি কিছুই জানি না। জানার দরকার হয়নি। তবে বুঝতে পারছি. একদিন হোক বা দু চার দিন—আজ তিন সপ্তাহ ধরে নিশ্চয় কমলার কথা ওরা জানায়নি। আর জানালেই বা কি হত, আমি তো আর শুনতে যেতাম না টেলিভিসনের কাছে বসে। যার চোখ নেই সে ওখানে গিয়ে বসে থাকবে কেন?

আচ্ছা, এমনকি হয় না, আমি ওদের অফিসে একটা চিঠি লিখে ফোন করে খোঁজ নিতে পারি? চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু কাজ হবে না। সরকারী ব্যাপার। কিসের দায় তাদের আমার গরজ বোঝার? ...তা হলে কি চুনি যা বলেছে, পুলিশ-টুলিশের কাছে গিয়ে খোঁজ করতে হবে? সেখানেই বা কী খোঁজ করব? হয়ত জিজ্ঞেস করবে, কোন খবর পেয়েছন নাকি? দেখেছেন? কে আপনি? কিসের রিলেসান আপনাদের?

না, পুলিশের কাছে যাওয়া যায় না। আমাকে হয় সন্দেহ করবে, না হয় গাধা ভাববে! ভাববে বুড়োটা উন্মাদ।

গাধা কথাটা কমলার খুব জিভে আসত। কাজের লোক, পাড়ার মুদিখানার রামজীবন, আমাদের লণ্ড্রির লোচন থেকে শুরু করে সবাই যে-কোনো সময় তার কাছে গাধা হয়ে যেতে পারত। মায়, আমি —তার স্বামীও। আমার বেলায় গাধার সঙ্গে ঘোড়া ও যোগ করত; গাধা-ঘোড়া। 'তোমার এমন আক্কেল-বুদ্ধি গাধা-ঘোড়াও বেশি বুদ্ধি ধরে।'

গাধার কথায় আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। কমলার সঙ্গে আমার একটা খেলা হত। তাসের খেলা। আমারই মগজ থেকে বেরিয়েছিল। দুজনে মিলে অন্য আর কী খেলা যায়। গয়ায় থাকার সময় জিন্‌জি এক ধরনের জুয়া খেলা শিখিয়েছিল তারই হেরফের করে রং-চোর আমি আর কমলা বিছানায় বসে সন্ধেবেলায়

খেলাটা খেলতাম। সাহেব বিবিতে চার পয়সা, গোলামে দুই, আর বাকির বেলায় প্রত্যেকটি রংয়ের পাঁচ রং জুড়ে এক পয়সা।

কমলা তখনও আমার বউ। নিয়োগী লেনে থাকি। কমলা তখনও প্রায় দিন তাস খেলত আমার গায়ের পাশে বসে। ওর মুখের পান-জর্দার গন্ধ আমার নাকের কাছে বাতাসে ভাসত।

তখন কি বৈশাখ মাস? না জ্যৈষ্ঠ? হয়ত গায়ে গায়ে। কী গরম না পড়েছিল ক'দিন। গরমে গায়ের চামড়া পুড়ে যাচ্ছিল, চোখ জ্বালা করছিল সারাক্ষণ, কমলার নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্তও পড়ল ক'দিন।

এমন গরমেই একদিন বে-খেয়াল এক দমকা ঝড়ের পর বৃষ্টি নামল। খেপা বৃষ্টিই বলা যায়। এন্টালি বাজারেও বেলফুলের মালা হাতে ছেলেগুলো চার ছ' পয়সায় মালাগুলো বিক্রি করে দিতে লাগল!

সন্ধ্যের মুখে বাড়ি ফেরার পথে সেই মালা আমি কিনে এনেছিলাম কমলার জন্যে। মালা আর পাঞ্জাবির দোকানের পেস্তা দেওয়া কুলফি। তাতে সিদ্ধিও ছিল।

গা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আমি যখন বিছানায় এসে বসলাম—কমলা ততক্ষণে খোঁপায় মালা জড়িয়ে বসে পড়েছে বিছানায়। কাঁচের ছোট ছোট প্লেটে সেই কুলফি। সিদ্ধি মেশানো। একপাশে তাসের গোছা।

বাইরে তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আসছে যাচ্ছে। গলিতে হাঁটুজল। পায়ে চলা মানুষের জল ভেঙে পথ হাঁটার ছপছপ শব্দ, রিকশার ঠুন ঠুন। বাদলা বাতাস জানালার পর্দা উড়িয়ে দিচ্ছে।

কুলফি খাওয়া শেষ হল। পান-জর্দা মুখে দিল কমলা। শুরু হল রং-চোর খেলা। তার আগেই জানলা ভেজিয়ে দিয়েছি আমি।

দিন ছিল কমলার। জিতেই যাচ্ছে। আমি হারছি।

তিন হাত খেলার পর কমলা বলল, 'তোমার হল কী?

'দিন খারাপ।'

'এবার জেতো।'

'না।'

'কেন?'

'দু চার দিন হারলে কী হয়!…তোমায় দেখছি! তোমায় এখন একেবারে দেবদাস সিনেমার চন্দ্রমুখী মনে হচ্ছে। একটু মাল নিয়ে বসলেই হত।' বলে আমি হাসলাম। কী শাড়ি ওটা?'

'এমনি শাড়ি। খারাপ!'

'দূর! দারুণ ভাল। ডুরেগুলো বেশ।'

কমলা হাসল। তার মুখের পান-জর্দার গন্ধ এসে লাগল নাকে। 'ডুরে? তোমার চোখে কী হয়েছে গো? এটা ডুরে?'

'ডুরে নয়?'

'নেশা করে এসেছ নাকি! লোকে তোমায় কী বলবে?'

'আনাড়ি।'

'গাধা!'

'আনাড়ি!'

'গাধা! বলেই কমলা হাসতে লাগল।

'গাধা' শব্দটা আমার ভাল লাগছিল না। আমি বলছিলাম—'আনাড়ি'; কমলা বলছিল 'গাধা'। বলতে বলতে আমরা যখন ক্লান্ত, জেদী—তখন কমলা হাসতে লাগল। থামল। আবার হাসল। তাস ছড়িয়ে দিল। আবার হাসল। আমিও হাসতে লাগলাম।

সিদ্ধির নেশা নাকি?

নেশাই হয়ত। দুজনের হাসির মাঝখানে সেই বৃষ্টি, সেই দমকা বাতাস, সেই রিকশার ঠুং ঠং, গলির রাস্তায় ছপছপ। তারপর অন্ধকার। ঘর ঘুটঘুটে। বিছানায় লুটোপুটি। ছুটোছুটি অন্ধকারে। কে কাকে ধরে? ফুলের মালা ছিঁড়ে গিয়েছে কখন, মেঝেতে নামানো কুলফির প্লেট পায়ে লেগে ছিটকে গেল, ভাঙল বিছানার বালিশ মাটিতে, কমলা কাঁদতে লাগল এবার। অসহ্য ব্যথা উঠেছে পেটে।

তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার আগেই বমি করল, বার দুই, যেন পেট থেকে সব উঠে আসছে। 'আমি মরে যাচ্ছি! ওমা, মা গো···'! আবার বমি করল। ভাসিয়ে দিল সব।

সারারাতই বমি করল কমলা।

কুলফিতে সিদ্ধি ছিল! আরও কিছু ছিল নাকি? বিষাক্ত কিছু?

সকালে দেখি কমলা মরার মতন মেঝেতে পড়ে আছে উলঙ্গ। চারদিকে বমি। বিছানায় ছড়ানো ছেঁড়া বেলফুল, মেঝেতেও। লুটোনো শাড়ি-জামা, তুলো ওঠা বালিশ।

কমলা মরেনি।

কিন্তু আমি জানি সেদিন দুজনের মধ্যে কিছু একটা মরেছিল! কী মরেছিল কেমন করে বলি! হয়ত জীবনের কোনো কোনো অদ্ভুত শেকড়—মাটির তলায় এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যে তার খোঁজ আমরা জানি না। সেগুলো কখন কোনটা অজ্ঞান্তেই মরে যায় কে জানে!

খেয়াল হল নাতির কথায়। "দাদা?"

"উঁ?"

"মা তোমায় খেতে ডাকছে।"

"তাই নাকি? যারা এসেছিল, চলে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে চল, খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। তোর বাবা ফিরেছে?"

"এই ফিরল!"

নাতির সঙ্গে খাবার ঘরে যাচ্ছিলাম, শুনলাম অন্তু বলছে, "আজকের কাগজটা কোথায় ইন্দিরা? একটা জিনিস মিস করে গিয়েছি—একটু দেখব। ওরা বলছিল, আমাদের সেই সেন সাহেব অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছেন অল্প কিছুদিন আগে। আজ বুঝি শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধর কী একটা

বেরিয়েছে ··।"

ইন্দিরা বলল, 'আমি জানি না। প্যাসেজে দেখো। টুলের ওপর থাকতে পারে। একটু খুঁজে নাও। বাবাকে খেতে দিচ্ছি।"

আমি তাকালাম। কাগজটা প্যাসেজের সাইড বোর্ডের মাথায় পড়ে আছে।

॥ নয় ॥

রাত্রেই আমার মনে হয়েছিল, আমি মস্ত বোকামি করেছি। চুনিকে ফোন করার আগে আমার অন্তত একবার পুরনো খবরের কাগজ দেখা উচিত ছিল। কাগজে কমলার খবর থাকতে পারত। কেউ হারিয়ে গেলে, বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে সাধারণত কাগজে আমরা একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকি। 'খোকা, তুমি যেখানেই থাকো ফিরে এসো, মা মৃত্যুশয্যায়' বা 'মাধুরী, তুমি কোথায় আছ জানাও, আমরা তোমার ফেরার আশায় বসে আছি—'কিংবা 'মা, তুমি ভুল বুঝে রাগ করে চলে গেলে। ছেলেমেয়ের অপরাধ নিও না। ফিরে এসো'—এই রকম কত বিজ্ঞাপন, তা ছাড়া আরও নানান রকমের নিরুদ্দেশ-বৃত্তান্ত।

এই দু তিন দিন, চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার পর পুরনো কাগজ দেখাই যে আমার উচিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। বোকামি হয়ে গেছে। কমলার খবর কি তার বাড়ির লোক কাগজ মারফত ছাপায়নি? মনে হয়, ছাপিয়েছিল। শুধুই কি টেলিভিসনে দেবে? কাগজই তো বেশি লোক পড়ে।

পরের দিন একটু বেলায় গেলাম মাইতিমশাইয়ের বাড়ি। রাধানাথবাবু কাগজের পোকা। উনি নিজেই বলেন, আজ পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরে হাজার দেড়েক চিঠি তিনি লিখেছেন কাগজে কাগজে, তার

মধ্যে সাতশোর মতন চিঠি তাঁর ছাপা হয়েছে নানান কাগজে। বলে নিজেরই রসিকতা করে বলেন, মশাই—রাধানাথ মাইতির সাতশো চিঠি বলে আমি একটা বই ছাপতে পারি তা জানেন? নানান বিষয়ের ওপর আমার চিঠি রয়েছে, এমন কি ফুড্ হ্যাবিট, মাছের চাষ, গঙ্গার জল বিশুদ্ধিকরণ সম্পর্কেও।

মাইতিমশাইয়ের কাছে গিয়ে পুরনো কাগজের কথা বললাম। আমাদের বাড়িতে আজকের কাগজ কাল মাছের আঁশ আর ময়লা ফেলার কাজে লাগে, কিছুই থাকে না।

মাইতিমশাইয়ের বৈঠকখানায় কিছু পুরনো আইনের বই আর বাসী কাগজের পাহাড়। তৃতীয় দর্শনীয় বস্তু বলতে—মা কালীর এক বিশাল ছবি। এমন শান্ত, শ্রীময়ী, বসনাবৃত কালীমূর্তি আমি আর দেখিনি। মাইতিমশাই বলেন—করুণাকালী। পটুয়ার আঁকা।

খুশি হয়েই কাগজ ঘাঁটতে ছিলেন মাইতিমশাই। তিনি অবশ্য বেশিক্ষণ থাকলেন না, দরকারী কাজে টালার দিকে যাচ্ছেন বলে চলে গেলেন।

আমি ঈশ্বর-বিশ্বাসী নই, তবু ওই কালীমূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকলাম মুহূর্ত কয়েক। করুণাকালী কি করুণা করবেন?

মাইতিমশাইয়ের ছোট মেয়ে বাণী চা দিয়ে গেল। বলল, 'জেঠু, আপনার কিছু দরকার হলে আমায় ডাকবেন। আমি ভিতরে আছি।'

হপ্তা তিনেকের কাগজ ঠিক নয়, প্রায় গোটা মাসের কাগজই ঘাঁটলাম। দু দুটো বাংলা কাগজ। কমলার খবর যেদিন আমি শুনেছিলাম, তার আগেই যে সে গৃহত্যাগ করেছে—এই হিসেবটা মনে রেখেই কাগজ ঘাঁটা।

ঘাঁটতে ঘাঁটতে শেষ পর্যন্ত কমলাকে পেয়ে গেলাম।

কিন্তু বড় সংক্ষিপ্ত সেই বিবরণ। মাস খানেক আগে, উনিশে *ফেব্রুয়ারি, কাউকে কিছু না জানিয়ে কমলা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।* ঠিকানা, দমদম সেভেন ট্যাংকস লেন। তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট

হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ছাড়ার সময় গায়ে সামান্য কিছু অলঙ্কার ছিল কমলার।

কমলার কোনো ছবি কাগজে ছাপানো হয়নি। অবশ্য তার বয়েস মোটামুটি গড়ন, দু একটি বিশেষ শারীরিক চিহ্নের কথা ছিল। ওর কোন সন্ধান পেলে দমদম সেভেন ট্যাংকস্ লেনের বাড়ির ঠিকানায় কাশীশ্বর দত্ত নামের ভদ্রলোককে জানাতে বলা হয়েছে।

কাশীশ্বর দত্ত? কে কাশীশ্বর দত্ত? রজনীর কেউ হবে? রজনী তো দত্ত ছিল না। রজনীর ছেলে-টেলে হলে দত্ত হবে কেন? তা হলে কি জামাই? কমলার কি ছেলে ছিল না? ওর কি মেয়ে হয়েছিল? কাশীশ্বর তার জামাইয়ের নাম? কমলা কি শেষ বয়েসে মেয়ে-জামাইয়ের কাছে থাকত! রজনী মারা গিয়েছে!

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। অনুমান করছিলাম। এ অনুমান পুরোপুরি ভুলও হতে পারে। হয়ত রজনীকে বিয়েই করেনি কমলা। একসঙ্গে থাকত। স্বামী-স্ত্রীর মতন। হয়ত বিয়ে করলেও পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। পরে কি অন্য কাউকে অবলম্বন করেছিল কমলা? নাকি, সে কারও আশ্রয়ে ছিল?

কাশীশ্বর দত্তর নাম ঠিকানা এক টুকরো কাগজে টুকে নিয়ে আমি যখন চলে আসছি মাইতিমশাইয়ের বিধবা বড় মেয়েটি অফিসে বেরুচ্ছিল। বলল, "আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে জেঠামশাই?"

"না। কই?"

"মনে হল মাথাটা কেমন টলছিল?"

"না, না—"আমি হাসলাম, "শরীর ঠিক আছে! আমি তোমার বাবার বসার ঘরে কাগজ হাতড়াচ্ছিলাম অনেকক্ষণ ধরে; হয়ত চোখ দুটোর জন্যে একটু মাথা টলতে পারে। ···তুমি অফিস চললে? এত তাড়াতাড়ি আজ?

"সরকারি চাকরি তো নয় জেঠামশাই, দশ মিনিট দেরি হলে একশোটা কথা শুনতে হয়। ...বাস পেতেই কতক্ষণ স্টপেজে দাঁড়িয়ে

থাকতে হবে !',

"তা ঠিক। এসো।"

ও চলে গেল। মাইতিমশাইয়ের বড় মেয়ে মানীর সব কথা আমি জানি না। শুনেছি, ওর স্বামী বীরভূমের দিকে বি ডি ও থাকার সময় খুন হয়েছেছিল। পলিটিক্যাল গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে বৃথাই বেচারীর জীবনটা গেল। মীনার একটিমাত্র সন্তান। মেয়ে।

গাছের ছায়ায় ছায়ায় দু দশ পা হাঁটতেই দেখি আমার পাহারাদার মহেশ আসছে। বিরক্ত হলাম। বাড়ির কাছাকাছি দু একশো গজ জায়গার মধ্যেও ঘোরা ফেরার স্বাধীনতা কি আমার নেই? ইন্দিরা আর অন্ত শুরু করেছে কী?

মহেশ কাছে এসে বলল, "বাড়িতে এক ভদ্দরলোক এসেছেন।"

"ভদ্রলোক? কে?"

"আমি চিনি না, বাবু। বউদি বসিয়ে রেখেছেন।"

"বউদি কি স্কুলে চলে গেছে?"

"না। যাবেন।"

বাড়ি এসে দেখি শঙ্করীপ্রসাদ।

"আরে তুমি?"

শঙ্করী বলল, 'ভাগ্নের বাড়িতে এসেছিলাম। ভাবলাম, এদিকে এসেছি যখন একবার ঘুরে যাই। তোমাদের এদিকে সাইকেল রিক্শাগুলো লাটসাহেব। দু একবার চক্কর ছাড়া বাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না এখানে, রিকশাঅলাগুলোকে ঠিক ঠিক বলতে না পারলে চলে যায়। বেশি টাকা চায়।"

আমি হাসলাম। "ও কিছু নয় হে, একটু বাবা-বাছা করবে, ওরাই তোমাকে ঠিকানা মত পৌছে দেবে?"

"বাবা-বাছারই যুগ আর নেই। আর ক'দিন পরে হাত কচলে স্যার স্যার করতে হবে। তা তুমি আছ কেমন? একটু শুকনো শুকনো লাগছে।

"ভালই আছি। মাঝে চোখটা আবার ভোগালো। এখন ঠিক। ··তার ওপর সিজন চেঞ্জ হচ্ছে, টান তো লাগবেই। বয়েসটাও তো বাড়ছে ভাই!"

"আবার চোখ!" শঙ্করীপ্রসাদ আমাকে দেখতে দেখতে বলল, "বিজয়ার পর এসেছিলাম। তখন—"

"এবারে মাস কয়েকের মধ্যে দু বার হয়ে গেল। ···যেতে দাও। হলেও কিছু করার নেই। পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি হে! এখন ভাবি ভাগ্যে যা আছে হবে। ·· তোমার খবর কী?"

শঙ্করীপ্রসাদ সিগারেটের প্যাকেট বার করল। আমার দিকে বাড়িয়ে দিল প্যাকেটটা, বলল, "ভাল নেই। সংসারে হাজারটা সমস্যা। কোন্‌টা আর মেটাবো! বড় ছেলে তল্পি গুটিয়ে হাওড়ায় চলে গেছে। তার নাকি ওখান থেকেই সুবিধে হবে অফিসের। লাস্ট টাইম তোমাকে বলেছিলাম না, সংসারটা এবার ভাঙবে। শুরু হয়ে গেছে ভাঙা! মেজো ছেলেকে ট্রান্সফার করে দিয়েছে ব্যাংক। মেজ বউমার আবার বাচ্চাকাচ্চা হবে। তাকে নিয়ে ফ্যাসাদে আছি। প্রথমবার সিজারিয়ান হয়েছিল, এবার কী হয় কে জানে! পরের জিনিস আগলাবার মতন করে বসে আছি। বড়ই দুশ্চিন্তা ভাই। ওদিকে মেয়েটা তো শ্বশুরবাড়িতে মুখ বুজে পড়ে আছে। এদিকে আমার বোন—এখানে যে আছে—তার বোধ হয় ক্যানসার-ট্যানসার হয়েছে! ব্রেস্ট ক্যানসার। কী সুখেই যে আছি! মাঝে মাঝে ভাবি, ভগবান এবার টেনে নিলেই পারেন।"

ছায়া এল। চা এনেছে। চায়ের সঙ্গে সোনপাপড়ি! নোনতা বিস্কিট।

শঙ্করী বলল, "মিষ্টিটা নিয়ে যাও। চায়ের চিনিটা চলবে, এমনি মিষ্টি চলবে না।"

"একটা খাও? মোদকের সোনপাপড়ি! ভাল লাগবে খেতে।"

"না। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! ব্লাড সুগারটা এমনিতেই হাই

নরম্যাল, ওটা বাদ দিয়েছি।"

শঙ্করী আমার বন্ধু। পুরনো পাড়ায় প্রতিবেশী ছিলাম। ও ভাল কাজকর্ম করত। সম্ভ্রান্ত বাড়ির ছেলে। ওর বাবা ছিলেন নামকরা অ্যাডভোকেট। পাড়ায় যথেষ্ট মানমর্যাদা দাপট ছিল তার।

আমরা চা খাচ্ছি, ইন্দিরা স্কুলে চলে গেল। যাবার আগে সামনে এসে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে গেল শঙ্করীর সঙ্গে।

গল্পে গল্পে বেলা সামান্য বাড়ল। শঙ্করী উঠি উঠি করছিল।

হঠাৎ শঙ্করী বলল, "ছোট ছেলেটাই আমার হেডেক্!"

"প্রলয়?"

"হ্যাঁ—প্রলয়! তিনি শুধু প্রলয় নয় মহাপ্রলয়। প্রলয় করে বেড়াচ্ছেন চতুর্দিকে। কলেজ লাইফটা ছাত্র রাজনীতি করল বাপের পয়সায় খেয়ে পরে; লেখাপড়া কাঁচকলা হল! তারপর গেল পেপার মিলে ইউনিয়নবাজি করতে। বড় নেতারা ছোট নেতাদের কপ্ কপ্ করে গিলে খায়। ওকেও খেল। শেষে রাস্কেল এক ফ্রেণ্ডের সঙ্গে মিশে বিজনেস করতে নামল। প্লাস্টিকের কলের মুখ। দমদমে কারখানা। সে-কারখানা তো চললোই না, এখন মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছে। যার জমিতে কারখানার শেড্ তুলেছিল সে এক মামলা ঠুকে দিয়েছে। বলছে, বেআইনিভাবে শেড্ তুলে কারখানা করেছিল!"

"দমদমে! কোথায়?",

"দমদমে···ওটা তোমার চিড়িয়া মোড় থেকে সামান্য এগিয়ে ভেতরের দিকে। কেন, তুমি চেনো নাকি কাউকে?"

"না না, জিজ্ঞেস করছি।"

"ওই যে দমদম রোড দিয়ে খানিকটা এগিয়ে। কী বলে—এক স্টপেজ এগিয়ে বাঁ হাতি···সেভেন ট্যাংকস···"

আমার বুকের মধ্যে ধাক্কা লাগল। "সেভেন ট্যাংকস্—! তুমি গিয়েছ ওদিকে।"

গিয়েছি বার কয়েক।"

"আমি আগে গিয়েছি ওসব রাস্তায়। এখন বোধ হয় কনজেসটেড?"

"কোনটা নয়? সারা কলকাতাই।

"আমি একজনের ঠিকানা খুঁজছি—তাই জিজ্ঞেস করলাম।"

"কার ঠিকানা?"

"কাশীশ্বর দত্ত।"

"কী জানি! কাশীশ্বর মহেশ্বর অনেক পাবে। এককালে এঁদের রাজত্ব ছিল—এখন হাট। চলে যাও না একদিন একটা ট্যাক্সি-ম্যাক্সি জুটিয়ে। পেয়ে যাবে।"

"দেখি।

শঙ্করী এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, "চলি। ...বোনটার খোঁজ নিতে এসেছিলাম, দেখা করে গেলাম। ....তুমি তো আমার বোনকেও চেনো, ভাগ্নেকেও চেনো—পারলে মাঝে মাঝে খোঁজখবর নিও একটু। অবশ্য খবর নিয়েই বা কী করবে! যে-রোগ বাধালো তাতে··" কথাটা আর শেষ করল না শঙ্করী। নিশ্বাস ফেলল বড় করে!

ওকে এগিয়ে দিলাম বড় রাস্তা পর্যন্ত।

দুপুরটা আজকাল যেন কেমন নিঃসাড় হয়ে যায় মাঝে মাঝে। গাছপালায় ঘেরা পুকুরের জলের মতন সব বুঝি থিতিয়ে গিয়েছে। অন্তত এখানে—এই নিরিবিলি ফাঁকা জায়গায়। কোকিল ডাকা বন্ধ হয়ে যায়, শালিখ চড়ুইও যেন ঘুমিয়ে পড়ে দুপুরে, কোনো সাড়া শব্দ থাকে না, বড় রাস্তায় বাসের শব্দও ভেসে আসে না এতদূর।

এই স্তব্ধতার মধ্যে চুপ করে শুয়ে থাকি, তন্দ্রা আসে, আসে না; ছেঁড়াখোঁড়া স্বপ্ন চোখে ভাসে, আবার মিলিয়ে যায়। ভোমরা ঢুকে পড়ে ঘরে। শব্দ করে ওড়ে। চলে যায়। বাইরের পেয়ারাগাছের

পাতায় ফাল্গুনের বাতাস লাগে।

ছায়া এই সময়টায় খানিক জিরোয়। বড় শান্ত মেয়ে। কাজেকর্মে হুড়োহুড়ি নেই, জিনিসপত্র নড়ানড়ির শব্দ নেই। আর খানিকটা পরে সে যাবে বকুলতলার মোড়ে, যিশুর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে! যিশুর স্কুল-বাস আসতে আসতে সাড়ে তিন।

ঘুম ছিল না। জানলার পরদা ফেলা। ঘোলাটে হয়ে আছে শোবার ঘর আমার। সামান্য আগেই এক ভোমরা ঢুকেছিল ঘরে। উড়ে গিয়েছে।

হঠাৎ আমার মনে হল, সেভেন ট্যাংক্স্ লেনে গিয়ে একবার কমলার খোঁজ করলে হয়!

কিন্তু কার কাছে খোঁজ করব? কাশীশ্বর দত্তর কাছে? সে কে? আমিই বা কে? আমি যেমন তার পরিচয় জানি না, সেও আমার পরিচয় জানে না। কাশীশ্বরের ঠিকানা খুঁজে বাড়ি বয়ে গিয়ে আমি কি তাকে বলব, কমলার আমি প্রথম স্বামী ছিলাম, তার খোঁজ করতে এসেছি?

লোকটা আমায় পাগল ভাবে। বা অন্য কিছু!

ও, যদি জিজ্ঞেস করে, 'আপনার হঠাৎ খোঁজ নিতে আসার কারণ। এত বছর বাদে?' ...আমি কোনো জবাব দিতে পারব না। নিজের কাছেই এর জবাব নেই তো অন্যকে কী জবাব দেব! তা ছাড়া প্রত্যেকটি মানুষেরই জীবনের কিছু গোপনতা থাকে। কমলা কি আমাকে গোপন রাখেনি তার পরের আত্মীয়জনের কাছে। রাখাই স্বাভাবিক। প্রথম স্বামীর কথা সে কেন বলবে? কোন দুঃখে!

এমনও তো হতে পারে, কমলা আবার বাড়ি ফিরে এসেছে। সে একদিন চলে গিয়েছিল বলে আর কি ফিরে আসতে পারে না নিজের বাড়িতে! হয়ত এসেছে। হয়ত কেউ তাকে ফেরত দিয়ে গেছে। আমি কেমন করে জানব! আবার উলটোটাও হতে পারে। কমলা আর ফেরেনি।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে বড় মাঠের দিকে হেঁটেই যাচ্ছিলাম। এখনও কত আলো। মহেশ আমার পেছনে। সে কখনও পাশে পাশে যায় না। সামান্য পেছনে থাকে।

কত অদল বদল হয়ে গেল এই ক'দিনে। মাঠঘাট শুকনো। পলাশগাছে নতুন পাতা ধরা শুরু হয়েছে ; কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলোতেও কচি ডালপালা গজিয়েছে এরই মধ্যে। মাঠের মাঝখানে সাইকেলে চক্কর মারছে দু তিনটি ছেলে। আকাশ সাদাটে-নীল থেকে ধীরে ধীরে সাদা হয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পরে আঁধার ধরবে গগনে।

বাঃ! বাতাসটাও দখিন-ছোঁয়া। মাথার ওপর দিয়ে বক চলল উড়ে। সালোয়ার কামিজ পরা দুটি মেয়ে রিকশা চেপে চলে যাচ্ছে কোথাও।

একটু জিরোবার জন্যে দাঁড়ালাম।

"মহেশ!"

"বাবু?"

"তুমি দমদম চেন?"

"চিনি বাবু। আমি সিঁথির রং-কলে কাজ করেছি।"

"ওই যে মোড়—কী মোড় বলে যে—"

"চিড়িয়ামোড়।"

"হ্যাঁ। চিড়িমোড় পেরিয়ে সেভেন ট্যাংকস্—"

"কাছেই বাবু। চিড়িয়ামোড় থেকে কাছে। হেঁটেই যাওয়া যায়—।"

"কাল পরশু একবার আমার সঙ্গে যাবে?"

"নয় কেন বাবু?"

মহেশ কিছু না বললেও আমি বুঝতে পারলাম, মনে মনে ও হয়ত ভাবতে পারে, বাবুর হঠাৎ দমদম যাওয়া কেন? ভাবাই স্বাভাবিক। বাবু যে আজকাল কলকাতা শহরের দিকে যান না, গেলেও ছেলে বা

ছেলের বউয়ের সঙ্গে বছরে এক আধবার কোনো দরকারে কি সামাজিকতা রক্ষা করতে—এটা যদিবা ওর জানা না থাকে, তবু সে জানে বাবুর চোখের অসুখের পর উনি বাইরে বাইরে ঘোরাফেরা বড় করেন না। বিশেষ করে এখন, সত্য চোখের অসুখটা সারতে না সারতেই! বাবু বাইরে যেতে চাইছেন—ভাল কথা, কিন্তু মহেশের একটা দায়িত্ব রয়েছে না! দাদা বউদি যদি কিছু বলে মহশেকে ?

এত কথা মহেশ ভাবছিল কি ভাবছিল না—আমি জানি না, কিন্তু আমার মনে হল একটা কৈফিয়ত খাড়া করা দরকার। "বুঝলে মহেশ—"

"আজ্ঞে ?"

"একজনের একটু খোঁজ নেওয়া দরকার।···আমার জানাচেনা পুরনো লোক।" বলে আবার আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলাম, "তোমার দাদা বউদি যদি শোনে দমদম যাচ্ছি. আমার আর যাওয়া হবে না। ওরা আমাকে এমন করে আগলে রাখে যে নিজের ইচ্ছেয় কিচ্ছুটি করার নেই।" আমি হাসলাম, হালকাভাবে যেন ব্যাপারটায় আমি মজা পেলেও একটু ক্ষুণ্ণ; বললাম, "ওদের জানানো হবে না বুঝলে ? তুমি আর আমি একটা ট্যাক্সি ধরে বেরিয়ে যাব।···এতক্ষণ আর— ! ধরো এক দেড়ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব। কী বলো ?"

মহেশ মাথা হেলালো। "হ্যাঁ, বাবু! কবে যাবেন ?"

"কালই যাওয়া যেতে পারে।"

"সকালে ?"

"সকালে !···না, সকালে নয়। বিকেলেই ভাল। সকালে বেলাটেলা হয়ে যেতে পারে। বউদি স্কুল বেরুবার আগে আমায় বাড়ি ফিরতে না দেখলে ভাববে !"

মহেশ মাথা নাড়ল নিচু করে। ঠিক কথা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। রোদ পড়ে গিয়েছিল আগেই, আলো আরও ফিকে হয়ে এল। বাতাস দিচ্ছে চমৎকার।

"কালই তা হলে যাওয়া যাক, কী বলো মহেশ?"

"আপনি যা বলবেন, বাবু!"

এবার আমি ফিরতে লাগলাম। পেছন থেকে বাতাস এসে আমায় যেন ঠেলে দিচ্ছিল।

॥ দশ ॥

আগেভাগে খেয়াল হয়নি; হলে হয়ত ট্যাক্সিটাকে মোড়ের মাথায় ছেড়ে দিতাম, বা পালবাবুর দোকানের কাছে। বাড়ির ফটকের সামনেই ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। ভাড়া চুকিয়ে নেমে এসে মহেশকে বললাম, "তুমি এবার যাও মহেশ।"

বাড়ি ঢোকার মুখেই ইন্দিরার সঙ্গে দেখা। মুখোমুখি।

বারান্দায় পায়চারি করছিল বোধ হয় ইন্দিরা। যিশুর গলা শোনা যাচ্ছিল বাড়ির ভেতরে।

ইন্দিরা বলল, "কোথায় গিয়েছিলেন?" বলে আমাকে দেখতে লাগল। নজর করে।

আমি যে বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমেছি এটা ও দেখেছে। এখন বোধ হয় আমার পোশাক আশাকও দেখছিল। পরিষ্কার ধুতি পাঞ্জাবি, আজ বিকেলেই পাট ভাঙা হয়েছে। বোঝা যায়; কোথাও বেরিয়েছিলাম।

"কলকাতার দিকে গিয়েছিলাম," আমি বললাম। এমনভাবে বললাম যেন কলকাতায় যাওয়াটা জরুরি ছিল "মহেশকে নিয়েই গিয়েছিলাম।"

ইন্দিরা একটু মাথা নাড়ল; মহেশকে সে দেখেছে। "আমায় কিছু বলে গেলেন না তখন?"

বিরক্ত হলাম। এমনিতেই মন-মেজাজ খারাপ, চঞ্চল। অশান্তি

আর উদ্বেগ রয়েছে। তার ওপর ছেলের বউয়ের এই কৈফিয়ত তলব আমার পছন্দ হল না। এরা আমায় কী ভাবে? আমি কি ওদের হাতের পুতুল! আমার নিজের কোনো স্বাধীনতা নেই?

ইন্দিরার কথার কোনো জবাব না দিলেও চলত। তবু বললাম, "আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

কথাটা যে মিথ্যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি দমদমের সেভেন ট্যাংকস্ লেনের দিকে কমলার খোঁজ করতে গিয়েছিলাম—ইন্দিরাকে এ-কথা বলা যায় না!

ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে বললাম, "ছায়াকে খাবার জল দিতে বলো।"

ইন্দিরা বলল "বলছি। আপনার ধুতিতে ওগুলো কিসের দাগ লাল লাল? পড়েটড়ে গিয়েছিলেন? ছড়ে গিয়েছে?"

ধুতির পায়ের দিকে কয়েকটা লাল ছোপ। আগে খেয়াল হয়নি। দেখলাম। মনে পড়ল, একটা পানের দোকানের সামনে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম কমলার খোঁজে গিয়ে, ছুটো মিস্ত্রিগোছের লোক পানের দোকান থেকে এক গাল পান জরদা মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে পিক ফেলেছিল রাস্তায় আর কী নিয়ে যেন ঝগড়া করছিল। পানের পিকেরই দাগ। ছিটকে এসে পড়েছে।

"পানের পিক!"

"পিক!"

"কলকাতার রাস্তায় পথ হাঁটা। কে কী করে ফিরেও দেখে না।" বলে আমি ঘরের দিকে চলে গেলাম।

সামান্য পরেই ছায়া এসে জল দিয়ে গেল খাবার।

তেষ্টা পেয়েছিল। জল খেয়ে একটু বসলাম।

ইন্দিরার ওপর আমি বিরক্ত হচ্ছিলাম। সে আমার ছেলের বউ। তার কাছে প্রত্যেকটি কাজের আগে অনুমতি নেবার কী আছে আমার! আর প্রতিটি কাজের দরুন তাকে কৈফিয়তই বা কেন দেব? আমি এটা

লক্ষ করেছি, অন্তুর অত কৈফিয়ত তলব নেই ইন্দিরার যেমন আছে। হয়ত অন্ত বাড়িতে সকাল সন্ধে, বা সে সব জিনিস নজর করে না বলেই কথায় কথায় 'কেন' 'কোথায়' করে না! ইন্দিরা বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকে বলেই তার নজরে পড়ে আমার ঘোরাফেরা, নড়াচড়া, খাওয়া-বসা। সোজা কথা, ইন্দিরার হাবেভাবে মনে হয়, ছেলে যাই করুক আসলে শ্বশুরের ঝক্কিটা তো তাকেই পোয়াতে হয়; কাজেই সমস্ত ব্যাপারেই আমার ওপর খবরদারি করার অধিকার তার আছে।

ছেলেকে বউকে আমি দোষ দিচ্ছি না, তার উদ্বেগ দুশ্চিন্তাও আমি বুঝি, কিন্তু সমস্ত সময়ে এত 'কেন' 'কোথায়' 'কী জন্যে'—আমার ভাল লাগে না। আমি ছেলেমানুষ নেই, অশক্তও নয়; আমার নিজের কিছু স্বাধীনতা রয়েছে। প্রতিটি ব্যাপারে যদি তুমি নাক গলাও, আমার পক্ষে অসন্তুষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক।

আজ যদি বিনু বেঁচে থাকত—তোমার এই নাক গলাবার সুযোগ কি হত বউমা? না, তুমি অমন কৈফিয়ত-চাওয়ার গলায় আমায় জিজ্ঞেস করতে পারতে, কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

তুমি যদি বিনুর চোখের সামনে এমন ব্যবহার করতে সে তোমায় ছেড়ে দিত না, সে তুমি তার যত আদরের ছেলের বউ হও, যত পছন্দেরই হও না কেন! তোমাকে সে বুঝিয়ে দিত, শ্বশুরের ওপর খবরদারি করারও মাত্রা আছে। তুমি ভেব না, এই বাড়ির তুমি মাথা। যে লোকটি মাথা সে এখনও বেঁচে আছে, তাকে ডিঙোবার চেষ্টা করো না। চোখের একটা বেয়াড়া অসুখ হয়েছে বলেই কি মানুষটা তোমাদের হুকুমের গোলাম হয়ে গেছে!

বিশ্রাম ঠিক নয়, সামান্য বসে আমি বাথরুমে চলে গেলাম। ধুতিটা ফেলে দিলাম এক কোণে। ছায়া কাল পরিষ্কার করে দেবে। পানের পিক-ফেলা লোক দুটোকে গালাগাল দিলাম, 'রাস্কেল ভূত কোথাকার!'

হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে ঘরেই বসলাম। ছায়া চা দিয়ে গেল। মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। ইন্দিরার ওপর আর রাগ হচ্ছিল

না। হাজার হোক, দুশ্চিন্তার দরুনই ও কথায় কথায় পাঁচটা প্রশ্ন করে! ঘরবাড়ি সামলানোর মতন শ্বশুরকে সামলানোর দায়িত্বও তার। কিছু হলে অন্ত তার বউকে বকাবকি করতে পারে।

আসলে মানুষের মন এই রকমই, কোথায় কী কারণে ক্ষোভ জমে, হতাশা জোটে, রাগ হয়, বেদনা দুঃখে পীড়িত হয় সে—তার জের আর কাটতে চায় না এক থেকে অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। ইন্দিরার হয়ত কোনো অন্যায়ই ছিল না, কিন্তু আমি নিজের মনের হতাশা ও ক্ষোভের জন্যে ওর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

আমার মনটন ভাল ছিল না। না-থাকার কারণ, কমলার খোঁজে গিয়ে আমি ব্যর্থ হয়েছি।

মহেশকে নিয়ে দমদমে যাবার সময়ই আমার মনে হয়েছিল, আমার পক্ষে নিজে কাশীশ্বরের কাছে যাওয়া উচিত হবে না। কারণ, আমি কাশীশ্বরের সাধারণ প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারব না, দেওয়া সম্ভব নয়। কে কাশীশ্বর আমি জানি না। যদি কমলার জামাই হয় বা অন্য কেউ হয়—তার কাছে গিয়ে কি আমি বলতে পারব, ওহে তোমার শাশুড়ি বা মা মাসি আমার প্রথমা স্ত্রী ছিল? কেউ কি এমন কথা বলতে পারে?

নিজে না গিয়ে আমি ঠিক করেছিলাম, মহেশকে পাঠাবো কাশীশ্বরের কাছে। কিংবা আশপাশের লোকজনের কাছে কথায় কথায় খোঁজ করবার চেষ্টা করব, কমলার কোন খোঁজ পাওয়া গেছে কিনা? সে ফিরেছে কি বাড়িতে? না নিরুদ্দেশ থেকে গেছে এখনও? নাকি তার সম্পর্কে কোনো দুঃসংবাদ শোনা গেছে—মারা গিয়েছে কমলা কোনো-না-ভাবে! বাস লরি চাপা পড়ে, ট্রেনের লাইনে কাটা পড়ে, অথবা কেউ তাকে খুনটুন করেছে! মাথার গোলমালের দরুন কমলা নিজেও তো আত্মঘাতী হতে পারে।

মহেশকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, সুবিধে মতন মিথ্যে গল্প সাজিয়ে সেভেন ট্যাংকস্ লেনের ঠিকানায় কাশীশ্বরের বাড়ি পাঠালাম। বললাম, মহেশ তুমি আমার কথা কিছু বলো না। বললে, এই নামের

এক মা—একদিন উল্টোডিঙির—হ্যাঁ, উল্টোডিঙিই বলো—এক ভদ্রলোকের বাড়িতে যান। তিনি কেনই বা গিয়েছিলেন কে জানে। নিজের নামধাম বলেছিলেন। থাকা-খাওয়ার জায়গা খুঁজছিলেন। তাঁর কথা থেকে মনে হয়েছিল, রান্নাবান্নার কাজ খুঁজছিলেন। কিন্তু তাঁকে দেখে রাঁধুনি-মেয়ে মনে হয়নি। আধবেলা তিনি ছিলেন। তারপর কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে আবার চলে যান।

দেখো মহেশ, তোমায় হয়ত ওরা জিজ্ঞেস করবে—তুমি কেন তার খবর নিতে এসেছ? তখন তুমি কী বলবে?

মহেশ নিজেই বলল, আমি বলব, সিঁথির রং-কলে আমি কাজ করতুম একসময়ে। এদিকে এসেছিলাম একজনের সঙ্গে দেখা করতে। ফেরার পথে হঠাৎ মনে হল, খবরটা করে যাই। উনি ঠিক ঠিক বলেছিলেন, না, মিছে কথা বলেছেন—জেনে যাই। খেপাটে লাগছিল ওঁকে ··একলা মেয়েছেলে—তায় বুড়ি ··

মহেশের যে এত বুদ্ধি কে জানত! গুছিয়ে গাছিয়ে বলেছে ভালই। বললাম, তুমি ঠিকই বলেছ, ওই কথাই বলো। তবে আমার কথা বলো না। আমার বাড়ির ঠিকানাও দিও না। উল্টোডিঙিতে কত বাড়ি ঘর—একটা কিছু বানিয়ে বলো।

মহেশ চলে যাচ্ছিল। আমি আবার তাকে ডেকে বললাম, মহেশ—উনি আমার আত্মীয় ছিলেন। অনেক বছর দেখাশোনা নেই। সম্পর্কও নেই। কিন্তু মানুষটি হারিয়ে গেছেন বলে মনটা বড় উতলা হচ্ছে। খোঁজ পেলে একটু নিশ্চিন্ত হই। বুড়ো মানুষ তো আমরা—একটুতেই উতলা হই।

মহেশ মাথা হেলিয়ে বোঝালো, সে সবই বুঝেছে। তারপর কাশীশ্বরের ঠিকানায় চলে গেল।

আমি বড় রাস্তার একদিকে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাসটাস যাচ্ছিল। ভিড়ও খুব। একদিকে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। মাটির স্তূপ। বাতাসে ধুলো উড়ছে। এসব রাস্তা যে আমার একেবারে অচেনা

অদেখা ছিল তা নয়, তবে আগে যেমন দেখেছি এখন আর তেমন নেই।

কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে বুঝতে না পেরে একটা জায়গা খুঁজে নিচ্ছিলাম। কাছেই এক বটগাছ। পাশাপাশি মিষ্টির দোকান, মুদিখানা। হাত কয়েক তফাতে ফটো তোলার দোকান এক, তার পাশে লণ্ড্রি। সবই আছে, ইলেকট্রিকের দোকান, কাঠের মিস্ত্রি, মুড়ি ছোলার দোকান।

দু দশ পা হাঁটাহাঁটি করতে করতে একটা পানের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ধুলো উড়ছে, দুর্গন্ধ আসছে নালার, একপাশে ময়লা জমে আছে একরাশ।

পানের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনলাম। দেশলাই। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার মতন জায়গাও ছিল। দাঁড়িয়ে থাকলাম।

মহেশকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। সে কাশীশ্বরের ঠিকানায় চলে গেছে।

অস্বস্তি এবং দুশ্চিন্তা দুই-ই হচ্ছিল। মহেশ কি কাশীশ্বরের সঙ্গে দেখা করে ঠিক ঠিক খবর আনতে পারবে? আমার কাছে যা-ই বলে যাক মহেশ, কাশীশ্বরের কাছে ঠিকমতন বানিয়ে বুনিয়ে সব বলতে পারবে তো? যদি ভুল বলে, যদি উলটো পালটা বলে বসে কিছু, ধরা পড়ে যায় মহেশ? যদি কাশীশ্বর সন্দেহ করে তাকে আটকায়? কিংবা শেষমেশ সে আমার কথা বলে ফেলে! তবে তো কাশীশ্বর আমার খোঁজেই এসে পড়তে পারে—'চলো দেখি কোন্ বাবু তোমায় নিয়ে এসেছে—?'

আর কমলা যদি নিজেই তার বাড়িতে ফিরে এসে থাকে পরে, যা অসম্ভব নয় মোটেই, (রাগের মাথায় হয়ত বাড়ি ছেড়েছিল, রাগ শান্ত হলে ফিরে এসেছে—) তবে তো মহেশ হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে!

আমি বোধ হয় বোকামি করলাম। এভাবে কমলার খোঁজ নিতে আসা উচিত হয়নি। কেনই বা তার খোঁজ নিতে এলাম? সে আমার কে? কমলা নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে যাক, সে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াক পথে পথে, মরুক, আত্মহত্যা করুক—আমার কী? কমলা আমার কেউ নয়।

পানঅলা যেন কিছু বলল আমায়। খেয়াল করিনি। তাকালাম তার দিকে। মানুষটি ঠিক জোয়ান নয়, একটু বয়েস হয়েছে। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ছিল। খুচরো পয়সা। আগে নেওয়া হয়নি। পানঅলার কাছে ছিল না। এতক্ষণে হয়েছে। পয়সার কথা আমার খেয়াল ছিল না।

"মিনিবাসমে যাবেন?" পানঅলা খুচরো দিতে দিতে বলল।

"বাস! না বাস ধরব না।"

"ট্যাক্সি?"

"না, পরে ধরব। একজনের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।"

"সড়ক ঘেঁষে দাঁড়াবেন না বাবু! চার পাঁচ দিন আগে মিনিবাস এসে মেরে দিল এক বুঢ়্‌ঢিকে!"

"বুঢ়্‌ঢিকে?"

"বেচারি গরিব বুঢ়্‌ঢি! হাসপাতালমে বেঁচে আছে না মর গিয়া কে জানে!"

সামান্য সরে দাঁড়ালাম।

পানঅলা বাঙালি নয় তবে ভালই বাংলা বুলি শিখেছে।

জিজ্ঞেস করব কি করব না করে শেষ পর্যন্ত কাশীশ্বরের ঠিকানা বলে বাড়িটা জিজ্ঞেস করলাম।

একটু ভেবে নিয়ে পানঅলা হাত তুলে উলটো দিকের একটা জায়গা দেখাল। "নাগিচেই আছে, বাবু।"

"কাশীশ্বরবাবু?"

"নেটা অ্যায়সা বাবু? মোচ আছে? গোরা?"

"জানি না।' আমার লোক গিয়েছে খোঁজ করতে। ও বাবু কী করে?"

"সিসার নল উল বানায়।"

"কাচের?"

"জী!"

"ওই বাড়ির এক বুড্‌ঢি মা—"

"হাঁ হাঁ; উ মা তো মন্দিরউন্দির যেত। দেখি না বহুত দিন—!"

"মন্দির যেত? কোন মন্দির?"

"কালী মন্দির।"

"কালী মন্দির! কোন কালী মন্দির?"

হাতের ইশারা করে পানঅলা বলল, দক্ষিণেশ্বর।

পানঅলা আর কিছু বলল না। বলতে পারল না।

মহেশ ফিরে আসছিল।

ট্যাক্সিতে ফেরার পথে মহেশ যা বলল তার থেকে মনে হল. কমলার নিরুদ্দেশ সম্পর্কে বেশি কথা কাশীশ্বর বলেনি। কমলা অবশ্য বাড়িতেও ফিরে আসেনি। না-আসুক ফিরে, কিন্তু কাশীশ্বরের তা নিয়ে মাথাব্যথাও তেমন নেই। সে থানায় জানিয়েছে, টাকা খরচ করে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—আর সে কী করতে পারে। নিজের খেয়ালে বেরিয়ে গিয়েছে কমলা, কে আর তাকে তাড়িয়ে দিতে গিয়েছিল! গিয়েছে যখন—, যাক্. মরুক বাঁচুক সে তার হাতে—কাশীশ্বরদের হাতে নয়। বদ্ধ উন্মাদ ও। ঘরে থাকতেও জ্বালিয়ে মারছিল। এখন পথেঘাটে ঘুরেই মরুক আর রেললাইনে গিয়ে মাথা দিক—কাশীশ্বরের দেখার কথা নয়।

"লোকটা কে?"

"বলল না।"

"আত্মীয়?"

"আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম বাবু। ভাঙল না।"

"আচ্ছা লোক তো!"

"বাড়ির বাইরে একজন ছিল। পাশে তার কয়লার দোকান। সে বলল, ওই জায়গা বাড়ি সবই বুড়িমায়ের ছিল। কাশীবাবুকে সে কাছে এনে রেখেছিল।

"আচ্ছা। ...বাড়িটা কেমন?"

"মাঠকোঠার মতন। নিচের তলা ইটের; ওপরে টিন আর ছাদ হল টালির।"

"কিসের কারবার করে লোকটা?"

"কাচের সরু সরু নল, ছোট ছোট শিশি, ফাঁপা..."

"বড় বাড়ি?"

"ছোটও নয়। নিচে কারখানা। ওপরে ওরা থাকে। কাপড়-চোপড় ঝুলছিল।"

"ও! কিন্তু লোকটা কে? আত্মীয় যদি না হবে..."

মহেশ বলল, "আমি ধরতে পারলাম না বাবু! তবে এটুকু বুঝলাম, বুড়ি মায়ের কাছেই মাথা গুঁজেছিল একদিন। তারপর জমি ঘরবাড়ি ওরাই নিয়েছে। লোক ভাল নয় বাবু! ওরা আছেও অনেক দিন ওই বাড়িতে, দশ বারো বছর।"

"কে বলল?"

"কয়লার দোকানের লোকটা।"

খানিকটা চুপ করে থেকে বললাম, "আর কোনো খবর পেলে না?"

মাথা নাড়ল মহেশ। বলল, "ওই মা যখন ওই বাড়িতে আসেন ওঁর সঙ্গে একটি বাবু ছিলেন। তিনি মারা গেছেন।"

"নামটাম শুনলে?"

"না।"

ট্যাক্সিতে আর কোনো কথা হল না। মহেশ যতটুকু পেরেছে খোঁজ নিয়েছে ; তার বেশি আর কী করতে পারে !

আমি বুঝতে পারছিলাম না, কমলা শেষ পর্যন্ত কলকাতা শহর ছেড়ে এখানে চলে এসেছিল কেন ? কার সঙ্গে ? রজনীর সঙ্গে ? না অন্য কারও সঙ্গে ? কেন কমলা মাঠকোঠা ধরনের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল ? সস্তাগণ্ডায় জমি বাড়ি পেয়েছিল বলে ? নাকি সে ঠিক করেছিল, সস্তার ভাড়াটেদের বাড়িতে বসিয়ে তাদের পেট চলার ব্যবস্থা করবে !

কমলার মাথায় যে নানান ধরনের খেয়াল চাপত আমি জানি। সে খেয়ালী ছিল, উটকো জিনিস তার মাথায় ভর করত ঠিকই কিন্তু কমলা বোকা ছিল না, পয়সা ছড়াবার খেলা সে খেলত না। বেঁচে থাকার কষ্ট তার জানা ছিল, যদিও খাওয়া-পরার জন্যে তাকে মাথা খুঁড়তে হয়নি। তার মা তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। পরে সে নিজেই বাঁচার ব্যবস্থা করে নিতে শিখেছিল। আমার সঙ্গে যতদিন ছিল, আমি কমলাকে সাংসারিক ব্যাপারে হঠকারিতা করতে দেখিনি।

দমদমের এক মাঠকোঠা বাড়িতে এসে মাথা গোঁজার কোনো কারণ হয়ত ছিল কমলার। সেই কারণটা আমি জানলাম না, ধরতেও পারলাম না।

ট্যাক্সিতে ফিরতে ফিরতেই মন বড় হতাশ বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল। কমলাকে তবে খুঁজে পাওয়া গেল না। জানাও গেল না তার কী হল ? বেঁচে আছে, না, মারা গেল !

কমলা কি সত্যিই বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল ? নাকি কাশীশ্বরের বানানো কথা ! লোকটা যে ভাল নয়—মহেশই বলেছে। তা যদি হয়—তবে কমলাকে পাগল সাজিয়ে পথে বার করে দিয়ে কাশীশ্বর আজ বাড়ি জমি সবই দখল করে নিল।

বেচারী কমলা !

॥ এগারো ॥

এমন কেন হল, কেন হয়—আমি জানি না। দু দিন পর পরই আমি স্বপ্ন দেখলাম কমলাকে। রাত্রে স্বপ্ন আর দিনে ঘুরে ফিরে তারই কথা ভাবনার মধ্যে জড়িয়ে থাকছিল। কেন এমন হচ্ছিল কে বলবে! সত্যি কথা বলতে কি কমলাকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। মানুষ তার জীবনের কথা পুরোপুরি ভোলে না; তবে অতীতের অনেক কিছু ভুলে যায়। কমলাকে আমি সেই ভাবেই ভুলে গিয়েছিলাম যেভাবে মৃত মানুষকে আমরা ভুলে যাই। কিংবা বলা ভাল, স্মৃতি থেকে সে ক্রমশ মুছতে মুছতে একেবারেই প্রায় মুছে গিয়েছিল। কদাচিৎ কোনো কারণে তার কথা মনে এলেও এত অস্পষ্ট ফিকে ভাবে সে আসত আর যেত যে তা নিয়ে কেউ গ্রাহ্য করে না, আমিও করিনি। বিনু বেঁচে থাকতে আমার ছেলেমেয়ের সামনে কখনো কমলার কথা বলত না। আড়ালে হয়ত কখনো এক আধবার খোঁচা মারত আমাকে, তাও তার সঙ্গে সংসার-জীবনের গোড়ার দিকে। পরে তার মুখে ও-কথা শোনাই যেত না। কমলার নামটাই শুধু ও জানত, আমার কাছ থেকে জেনেছিল বিয়ের পর পর। আর ও জানত, কমলা মারা গিয়েছে! আমার ছেলেমেয়েরাও আভাসে শুনেছিল, তাদের মায়ের সঙ্গে আমার বিয়ের আগে অন্য একজনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল বটে, কিন্তু সে আর বেঁচে নেই। কমলাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো কারণ আমাদের সংসারে হয়নি কোনোদিন।

আজও হত না, যদি ওই আশ্চর্য ঘটনাটি না ঘটত! আমি কেমন করে জানব, টেলিভিশনের দেখা একটি আবছা মুখ, তার নাম, তার চোখমুখের বর্ণনা—এইভাবে আমাকে নাড়িয়ে দেবে, ওলটপালট করে

দেবে সব! কেন? কী জন্যে?

এর কোনো কারণ আমি খুঁজে পেতাম না। কমলার জন্যে চাঞ্চল্য, মায়া-মমতা অনুভব করার কোনো সঙ্গত কারণও আমার নেই। সে আমাকে বিয়ে করেছিল, সংসারও করেছে কিছুদিন—কিন্তু ও রজনীকে ভালবেসে ফেলেছিল। হয়ত এই ভালবাসার মধ্যে জটিলতা ছিল, ফলে ওরা চালাকিও করেছে আমার সঙ্গে, আমাকে ঠকিয়েছে, প্রবঞ্চনা করেছে! তা হলে কেন আমি আজ কমলার জন্যে চঞ্চল হচ্ছি?

ঈশ্বরই জানেন, কেন! আমি জানি না। অথচ দু দিন পর পর রাত্রেই আমি স্বপ্ন দেখলাম, কমলা ছেঁড়া খোঁড়া ময়লা থান পরে, নোংরা মেথে গাছতলায় বসে আছে; তার মাথার সাদা চুলগুলোয় কপাল মুখ প্রায় ঢাকা, সে একেবারেই অন্যমনস্ক, তার ভিখিরি ভিখিরি চেহারা, পাগলের মতন দৃষ্টি—কিছুই যেন তার খেয়ালে নেই, গায়ের পাশে রাস্তার কুকুর শুয়ে আছে, দু চারটে পাঁচ পয়সা দশ পয়সা তার সামনে ছড়ানো, কারা যেন ফেলে গেছে।

গাছতলায় যে-কমলা বসে ছিল, তাকেই আবার দেখি কোনো নোংরা জায়গায় শুয়ে আছে কাত হয়ে, ঘুমিয়ে পড়েছে। কতকগুলো ছেঁড়াখোঁড়া কাগজ উড়ছে চারপাশে, মনে হয় যেন সে মরে পড়ে আছে রাস্তায়।

স্বপ্নের মধ্যেই দেখলাম, কমলা বুঝি স্নানের জন্যে নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সিঁড়ি ভেঙে, যেতে যেতে পা হড়কে পড়ে গেল…!

এমন করে কমলা আমাকে কেন টানছে বুঝতে না পারলেও আমার মনে হচ্ছিল, এ একরকম অস্বাভাবিক অথচ অ-প্রাকৃত ডাক। কে যেন আমায় ক্রমশই ওর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, বলছে—আর একটু দেখো না, আরও একটু খুঁজে দেখো। বেচারীকে এমনভাবে মরতে দিচ্ছ কেন?

আশ্চর্য! কমলা যদি বেঁচেই থাকে, তাকে আমি খুঁজেও পেয়ে যাই

হঠাৎ—আমি কি আজ তাকে আমার বাড়িতে এনে আশ্রয় দিতে পারব? অসম্ভব। আমার বাড়িতে তার আশ্রয় হবে না।

তবে? তবে কমলাকে খুঁজে পেলে তার নিজের বাড়িতে রেখে আসা যায়। যায় না? কাশীশ্বর অভ্যর্থনা না করুক আপত্তি করতে পারবে না।

এমনকি, আমার মনে হল, আজও যখন আমি বেঁচে, আমার পুরনো কিছু বুড়ো বন্ধুবান্ধবও বেঁচে আছে, তাদের মধ্যে এক-আধজন হয়ত চেষ্টা করলে কমলাকে কোনো আশ্রমে বা পাগলা হাসপাতালে রেখে দেবার ব্যবস্থা করতে পারে। মুরারি তো পারেই। তার নানা জায়গায় খাতির।

আশা-ভরসা পুরোপুরি ছেড়ে দেবার আগে আমার মনে হল, একবার অন্তত শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক্।

দিনটা সকাল থেকেই ছিল ঘোলাটে। ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে আলো আসার মতন সেই ঘোলাটে আলো সামান্য মেঘলা হয়ে আসছিল দুপুরের দিকে। তবে বৃষ্টির কোনো চিহ্ন নেই। বরং এই ঈষৎ মেঘলা ভাবটুকু ভালই লাগছিল। বাতাস আছে। মনোরম দিন।

বিকেলে মহেশকে বললাম, "চলো, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।"

"কোথায় বাবু?"

"দক্ষিণেশ্বরই চলো।"

মহেশ পুজোপাঠ ঠাকুর দেবতা ভালবাসে। ভক্ত মানুষ। খুশি হয়ে বলল, "দক্ষিণেশ্বর! চলুন বাবু। অনেক দিন মন্দিরে যাইনি।"

"আজই চলো। সন্ধের আগেই ফিরে আসব।"

ট্যাক্সি পেলাম ব্যাঙ্কের মুখে।

মহেশ বলল, রাস্তায় ভিড় না পেলে আমরা তাড়াতাড়ি দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে যাব।

রাস্তায় ভিড় সাধারণ, তবে ট্যাক্সিটা খানিক ভোগালো।

এদিকে দেখি মেঘলা আরও একটু গাঢ়। বৃষ্টি হবার মতন মেঘ নেই, হলেও, দু চার ফোঁটা হতে পারে, ছেলেবেলায় আমরা যাকে বলতাম, 'পথভোলা বৃষ্টি।' আকাশ থেকে এক-আধটা মেঘ ভেসে যেতে যেতে দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি দিয়ে গেল ; ধুলোও ভিজলো না ; গন্ধ উঠল সোঁদা সোঁদা। তেমন একটু জল বা এক আধবার দমকা ঝড় হতেই পারে। কালবৈশাখীর সময় এখন নয়।

দক্ষিণেশ্বরে পৌছতে পৌঁছতে বিকেল মরে এল।

মহেশ গেল হাত পা ধুয়ে আসতে ঘাটে। হাত মুখ ধুয়ে এসে ফুল মিষ্টি ধূপ কিনবে, মন্দিরে যাবে পুজো দিতে।

ও যাক, আমি বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়াব।

খানিকটা পরে মহেশ এল। পয়সা দিলাম ওকে বললাম, "তুমি পুজো দিয়ে ওই বাগান-টাগান ঘাটের দিকে আমাকে খুঁজো। আমি থাকব। কেমন?"

"আপনার নামে পুজো দেব।"

"আমার নামে নয়, দাদাদের নামে দিও। নাম জানো তো? অন্তুর ভাল নামটাম বলে দিলাম।

চলে গেল মহেশ।

আজ কী বার? বুধবার। এক এক সময় আমার বারের গোলমাল হয়ে যায়। সপ্তাহের মাঝামাঝি হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক—ভিড় আজ কম। মানুষজন আছে, গাড়িটাড়িও রয়েছে ক'টা, মাঠে ছড়ানো দোকান পশার গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে। মেঘলার সঙ্গে মেশানো বাতাস ঠাণ্ডা, গঙ্গার হাওয়া বয়ে আসছে এপাশে।

কত বছর পরে এখানে এলাম কে জানে! কমলা এদিকে আসত, বিনুও। ওদের নিয়ে এসেছি। তরু আর অন্তুকেও বেড়াতে নিয়ে এসেছি এক আধবার ছেলেবেলায়। তারপর আর মনে পড়ে না।

জায়গাটা কি পালটে গিয়েছে? স্পষ্ট মনে করতে না পারলেও আমার ধারণা হচ্ছিল, আগে এই বাগান, ঘাট আরও সুন্দর ছিল, নিবিড় নির্জন ছিল। এখন সেসব নেই। গাছপালাগুলো কি উধাও হয়েছে? কেটে ফেলা হয়েছে? কে জানে! বড় নোংরা। পাতা উড়ছে, কাগজের টুকরো উড়ছে, ঘাটের দিকের বাঁধানো রাস্তায় হাঁটা যায় না, দুর্গন্ধ!

ওরই মধ্যে মানুষজন। গাছতলায় বসে আছে মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক, পাশে তাঁর স্ত্রী, দু তিনটি ছেলে গল্পগুজব করছে, একটি লম্বাচওড়া বউ তার আত্মীয়দের নিয়ে পঞ্চবটীর কাছে বেড়াচ্ছে আর এটা ওটা দেখাচ্ছে।

বাগানের দিকে ঘুরতে ঘুরতে একটা সিগারেট খেলাম। যারা বসে আছে, হেঁটে বেড়াচ্ছে যারা—সকলকেই লক্ষ করছিলাম। না, কমলার মতন কাউকে দেখলাম না। এতকাল পরে কমলাকে দেখলে আমার চট করে চেনার কথা নয়, হয়ত তার এতই পরিবর্তন হয়েছে যে পাশে এসে দাঁড়ালেও সহজে চিনতে পারব না। তবু কোথাও তো খটকা লাগবে! লাগলেই আমি তাকে চিনে নিতে পারব। টেলিভিসনের সময় কেমন করে চিনেছিলাম!

যা ভেবেছিলাম তাই। টপ টপ করে বড় বড় ফোঁটা পড়ল। বৃষ্টি। পড়েই বন্ধ হয়ে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে কেউ কেউ বাঁধানো বসার জায়গাগুলো থেকে উঠে পড়তে লাগল।

আমার বোধ হয় ভুল হল একটু। স্বপ্নে কী দেখেছি—সেটা সত্যি না হতে পারে! কমলাকে গাছতলায় বসে থাকতে দেখব কেন? সে তো মন্দিরের মধ্যেও থাকতে পারে। হয়ত ওপাশে কোথাও বসে থাকে নাটমন্দিরে, চাতালে! অবশ্য সবই 'যদি'। যদি থাকে, যদি দেখতে পাই!

দেখতে দেখতে ছায়া আরও ঘন হয়ে আসছিল, মেঘলা জমছিল।

মন্দিরের মধ্যে থেকে একবার ঘুরে এলে হয়!

কমলা কোথাও নেই। মন্দিরের মধ্যে, আশেপাশে, বাগানে—কোথাও নয়। তা হলে সে নেই! আমার স্বপ্ন অর্থহীন, আমার আসা বৃথা।

মন্দিরের বাইরে এসে বড় ফাঁকা লাগছিল। এই ছেলেমানুষি কোনো প্রয়োজন ছিল না। কমলার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর বয়েস আমার নেই। আমাকে কি এখন এসব মানায়? সিনেমায় হামেশাই এমন দেখা যায়, কিন্তু জীবন তো সিনেমার সস্তা গল্প নয়।

মেঘলা যে আরও ঘন হয়েছে, আঁধার হয়ে এল চারপাশ, লোকজন উঠে যাচ্ছে, ধুলো উড়ল, বাতাস এল ঠাণ্ডা—বোঝার আগেই আমি কখন হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার বাঁধানো ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছি।

মনে হল, হাত মুখ একটু ধুয়ে নিই। ধুলো পড়েছে চোখে।

ঘাট ছেড়ে সবাই উঠে যাচ্ছে। হাত মুখ ধুয়ে সরে আসতেই দেখি ঘাটের পাশে, সামান্য তফাতে কয়েকটা নৌকো বাঁধা।

এমন সময় নজরে পড়ল, একটি মহিলা নৌকোর বাইরে বসে আছে। মলিন বেশ, মাথায় কাপড় নেই, সাদা চুলে ভরা মাথা, গায়ের আঁচল পাশে ছড়ানো, আকাশ দেখছে, না, গঙ্গা বোঝা যায় না।

কমলা নাকি?

হয়ত কমলাই।

হঠাৎ বাতাস এল দমকে দমকে, ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল, মিহি বৃষ্টি, গঙ্গার জলে জোয়ারের টান, নৌকো দুলছিল, অন্ধকার আর ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টির মতন পাতলা বৃষ্টির মধ্যেও মনে হল—কমলার ছায়াই যেন দুলছে গঙ্গার জলে। ও কি এবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কমলার কাছে যাবার জন্যে আমি হাত নেড়ে কাউকে ডাকলাম। কাকে? মাঝিকে?

হাত উঠিয়ে ইশারায় কমলাকে ডাকলাম। কমলা, আমি। আমি। আমি আসছি। একটু বসো। কথা আছে।

বৃষ্টির ফোঁটা বড় হতে লাগল। ঘাট ফাঁকা। কমলা অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। আমার আর কমলার মধ্যে যেন আড়াল পড়ে যেতে লাগল বৃষ্টির আর অন্ধকারের ছায়া-জড়ানো অন্ধকারের।

ঘাট কী নির্জন। কোথাও কেউ নেই। উঠে গিয়েছে বৃষ্টি বাঁচাতে। আমি ভিজে যাচ্ছিলাম।

কমলা? কমলা?

কোনো সাড়া নেই।

কমলা, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না? আমি—তোমার···

বৃষ্টির জলে আমার চোখ মুখ ভিজে যাচ্ছিল। মাথাও। জামাটাও ভিজে গিয়েছে।

কমলা কি আমার ডাক শুনতে পেয়েছিল? কে যেন বলল, তুমি কী চাও? কেন এসেছ?

কেন এসেছি?

ও কী! নৌকোর দড়ি কে খুলে দিল? কে? জোয়ারের টানে দুলে গেল নৌকো। শব্দ হচ্ছিল জলের, ছলাৎ ছলাৎ। বৃষ্টি পড়ছে। নৌকোটা বুঝি সরে গেল।

কমলা, তুমি তো আমার আসল কথাটা জানলে না কোনোদিন। বলা হল না তোমায়! তোমার কি মনে পড়ে, একদিন নিয়োগী লেনের বাড়িতে মাঝরাতে আমাদের বিছানায় আগুন লেগেছিল, আমি তোমার পাশে ছিলাম না, বাইরে উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, বৈশাখ টৈশাখ হবে তখন, সারাদিনের তপ্ত আকাশ তখন ঠাণ্ডা, তারায় তারায় ভরা, আমি ভাবছিলাম বাইরে থেকে তোমার ঘরের দরজার শেকলটা তুলে দি, তুমি তোমার বিছানার, শাড়ি জামার, ঘরের আগুনে পুড়ে মরো। হ্যাঁ, আমি চেয়েছিলাম তুমি মরো।

চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি। শেষ পর্যন্ত আমি তোমার ঘরের শেকল তুলে দিইনি। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি হাট করে, তোমার শাড়ির আগুন নিভিয়েছি। বিছানায় জল ঢেলেছি বালতি বালতি।

তুমি সেদিন ভয়ে দিশেহারা উৎকণ্ঠায় থরথর করে কাঁপছিলে, কাঁদছিলে। আমাকে এমন চোখে দেখছিলে যেন আমি কোনো ভয়ংকর এক জন্তু, পশু! তুমি আমায় বলেছিলে, 'আমি, আমার বাড়ি, আমার ছায়াও আজ থেকে আর তোমার নয়।'

আমি জানতাম তোমার কোনো কিছু, এমন কি তোমার ছায়াও আর আমার নয়। আমার নেই। সবই রজনীর দখলে গিয়েছে। শুধু মাঝে মাঝে আমরা একই বিছানায় শুই।

কিন্তু সেদিন ওই ঘরের শেকলটা বাইরে থেকে তুলে না দিয়ে আমি তো তোমাকে বাঁচিয়েছিলাম, কমলা।

কেন?

ভয়ে? না, ভালবাসায়?

মানুষের ভালবাসায় সবই থাকে, কমলা। আকাশ থেকে ঝরে পড়া অলৌকিক কোনো বস্তু নয় ওটা; অপার্থিব সামগ্রী কোনো। এই মাটিতে তার জন্ম। মানুষের সংসারে। তার গায়ে মাটির ধুলোময়লা আবর্জনা তো লেগে থাকবেই কমলা; আবার এই মাটির গন্ধ, তার কোমলতা, তার গুণ-অগুণ···

"বাবু—বাবু—" মহেশ চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে বুঝি ঘাটের দিকেই আসছিল।

কমলার নৌকোর দড়ি কি ছিঁড়ে গেল! সবই ঝাপসা। আর ওকে দেখতে পাচ্ছি না। বৃষ্টির ফোঁটা, শব্দ, গঙ্গার জলের ছলছল···

চোখের সামনে বৃষ্টির আড়াল। অন্ধকার হয়ে এল। কমলাকে আমি খুঁজে পেলাম, নাকি পেলাম না, কে জানে! তার বদলে আচমকা বিনুকে পেলাম। কত বোকাই ছিল বিনু। বিয়ের পর কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে একবার দক্ষিণেশ্বর এসেছিল। পুজোটুজো দিয়ে ফেরার সময় কী বৃষ্টিই না নামল। বিনু আর আমি বৃষ্টিতে ভিজে যখন সপসপে—হঠাৎ বিনু বলল, 'যাঃ, আমার বড়

লজ্জা করছে!'

'কেন?'

'আহা! জানো না!' বলে নিচু মুখে নিজের শরীরের দিকে তাকাল।

আমি হেসে ফেললাম! বিনুর পেটে তখন তরু এসেছে। অবশ্য আমরা জানতাম না কে আসবে! তরু না অন্ত? তরুই এল অবশ্য একদিন।

মহেশ এসে আমাকে ধরে ফেলল। ভয় পেয়ে গিয়েছিল। "বাবু!"

"ভয় নেই। ঠিক আছি। চলো। বৃষ্টিটা হঠাৎ এসে পড়ল।" মহেশ আমাকে ধরে থাকল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ভিজে সিঁড়ি দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

অনাবৃত

আজ আবার নন্দিতাদির চিঠি পেয়েছি।

আমরা এখানে এসেছি আজ প্রায় দেড় মাস। পুজোর পর পর এসেছি. কালীপুজোর তখনও দেরি ছিল, এখন তো শীত পড়ে গেল। আসার দিন কয়েক পরে নন্দিতাদির এক চিঠি এল। সেই চিঠি পড়েই আমার খটকা লেগেছিল। জবাব দেবার সময় ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলাম অনেক কথা। ছোটখাট জবাব লিখলাম।

দিন আট দশ বাদে আবার চিঠি এল নন্দিতাদির। এবার তার চিঠিতে চাপাচুপি কম। ওর যা বলার মুখ ফুটে না বললেও আকারে ইঙ্গিতে সবই বলেছে। এখন দেখছি, অকারণ খটকা আমার লাগেনি। দ্বিতীয় চিঠির জবাব আমি দিলাম, তবে চেষ্টা করলাম ওর ইঙ্গিত-গুলোকে উপেক্ষা করতে। আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। বিরক্ত হলেও ওকে সরাসরি বুঝতে দিইনি। বরং এই জায়গাটায় শরীর সারাতে এসে আমি যে বোকামি করিনি সেটাই জোর দিয়ে লিখলাম। লিখলাম, এখানের জল-বাতাস কী চমৎকার, যে ছোট বাড়িটা আমরা পেয়েছি সটা কেমন নিরিবিলি ছিমছাম, কাজের মেয়েটিও ভালই জুটেছে। সকালে আমরা কখন উঠি ঘুম থেকে, কোথায় বেড়াতে যাই হাঁটতে হাঁটতে, কেমন করে শালপাতার ঠোঙায় কুচো নিমকি নিয়ে বসে খাই, জিব পুড়ে যায়, মাটির খুরির চায়ে কী স্বাদ, এখানের ছোট্ট বাজারে কেমন সব টাটকা ফুলকপি উঠেছে, একেবারে ক্ষেত থেকে তুলে আনা, টমেটোগুলোর কেমন রঙ—এই সব লিখে নন্দিতাদিবে বোঝাতে চাইলাম, তুমি যা লিখেছ তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না, তার জবাবও আমার কাছে আশা করো না।

নন্দিতাদি আবার চিঠি দিল। এবার আর আভাস ইঙ্গিত নয়, সংকোচও নয়—একেবারে সাফসুফ লিখল, তুই এটা কী করছিস?

নিজের বয়েসের কথা ভুলে গিয়েছিস? তোর কি মনে হয় না, ওই ছেলেটা—রাজা তোর চেয়ে কত ছোট! ও যে প্রায় তোর ছেলের বয়েসী! ছি ছি, ইন্দু—এ তুই কী করছিস? আমি ভাবতে পারি না তোর মতন মেয়ে এমন কাজ করতে পারে। তুই কি পাগল হয়ে গিয়েছিস? ধরিত্রীবাবু মারা গিয়েছেন আজ ছ' মাসও হয়নি। হাজার হোক, তুই যে বিধবা এটা তো তোকে মানতেই হবে। সেকেলে বিধবাদের মতন তোর মতিগতি মানামানি কেই বা চায়। তবু তুই যে আজ ধরিত্রীবাবুর বিধবা স্ত্রী—এ-কথা তো অস্বীকার করতে পারবি না। নিজেকে তুই সামলা, ইন্দু।

নন্দিতাদির তৃতীয় চিঠির উত্তর আমি দিতে চাইনি। ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। রাগে বিরক্তিতে আমার ঘুম বন্ধ হয়ে গেল। মাথা আগুন হয়ে থাকত, গা যেন জ্বলে যেত। সকাল সন্ধের বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, সন্ধ্যের পর ঘরে বসে গল্পগুজব, গান শোনা, রগড় করে তাস খেলা—সবই কেমন খাপছাড়া হয়ে গেল। একদিন রাগের মাথায়, বেখেয়ালে সকাল বিকেল মাথা ভিজিয়ে স্নান করে ফেললাম। এখানের জল ভাল, তবে ভারী। কুয়োর জল। তার ওপর শীত পড়তে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা লেগে আমার জ্বরজ্বালা হয়ে গেল।

রাজা কদিন ধরেই বলছিল, ইন্দুদি, তোমার হয়েছে কী? শরীরটা বেশ সারছিল হঠাৎ রুক্ষ মেরে গেল! ডাক্তার দেখাবে? চলো!

আমি যত না-না করি, রাজা তত জেদ ধরে।

শেষে এক ডাক্তার ধরে আনতেই হল, তখন আমার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর উঠে গেছে দুয়ের ওপর।

এখানে ডাক্তার বদ্যি প্রায় নেই। হাতুড়ে এক-আধজন আছে স্টেশনের দিকে।

আমার ডাক্তারটি আধবুড়ো। বলল, বুকে সর্দি জমেছে। প্রেশারও একটু বেশি। সেরে যাবে।

ডাক্তারের ওষুধের গুণেই হোক, কিংবা আমার ভোগ ছিল না বলেই হোক, জ্বরজ্বালা ছেড়ে গেল দিন তিনেক পরে।

মনে মনে আমি ততদিন ঠিক করে নিয়েছিলাম, নন্দিতাদির চিঠির জবাব আমি দেব। এমনভাবে দেব, যেন—ও আর আমাকে ওভাবে চিঠি লিখতে সাহস না করে।

চিঠিটা লিখব লিখব ভাবছি এমন সময় আবার এক চিঠি এল নন্দিতাদির। সে ভেবেছে, আমি তার আগের চিঠি পেয়ে এত চটে গিয়েছি যে ওর চিঠির কোনো জবাব দিচ্ছি না।

এবার খানিকটা নরম-সরম করে নন্দিতাদি লিখেছে, তুই আমাকে ভুল ভাবছিস। আমি কি তোর শত্রু? না তোর শ্বশুরবাড়ির কেউ? আমি তোর বন্ধু। তোকে ভালবাসি বলে তোর ভাল চাই। আগে কি তোকে কখনও এমন করে বলেছি! ধরিত্রীবাবু গিয়েছেন আজ ছ' মাস। এই ছ' মাসে তোকে আমি ভাল করেই নজর করেছি। তোর অনেক জিনিস আমার পছন্দ হয়নি, ভাল লাগেনি। মুখ ফুটে তোকে বলতেও পারিনি, ইন্দু এসব করিস না। মানুষ অন্ধ নয়, তার মন গঙ্গাজল নয়। তুই সমাজ সংসারে বাস করিস। তোর কি চোখ কান নেই? বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে? না না করেও তোর বয়েস চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে। এই বয়েসে সদ্য সদ্য বিধবা হয়ে এ-সব তুই কী করছিস? একটা চব্বিশ পঁচিশ বয়েসের ছেলে তোর ধ্যান-জ্ঞান হল কেমন করে! মাথা ঠাণ্ডা করে ভাব লক্ষ্মীটি! তুই না অবুঝ, না সেই জাতের মেয়ে যারা বে-তোয়াক্কা! এই বয়েসে তোর মতিভ্রম কেমন করে ঘটল আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমার কর্তাকেও আমি কিছু বলি না এ-সব সম্পর্কে, বলতে লজ্জা করে। তবে সে যে বোঝে, লক্ষ করেছে তোদের মেলামেশা তা তার কথা থেকেই ধরা যায়। আমি এড়িয়ে যাই। কথা বাড়ালেই কখন কী বেরিয়ে পড়বে! শুধু আমার কর্তা কেন, আমাদের অনেকেই ব্যাপারটা লক্ষ করেছে। সুবোধবাবু, দত্তরায়, অঞ্জলি, কণিকাদি, সেন-গিন্নি— কে

নয় !···তুই আমার ওপর রাগ করতে পারিস, কথাগুলো তোর বিষ লাগবে জানি ; তবু তোকে বলছি—আমি তোর বন্ধু। তোর খারাপ হোক, তুই নিজেকে নষ্ট করিস—এ আমি চাই না। আজ তোর কাছে যা বড় হয়ে উঠেছে দু দিন পরে বুঝবি সেটা তোর সর্বনাশ করে গেল।....চিঠির জবাব দিবি।

'কার চিঠি, ইন্দুদি ?'

'কলকাতার।'

'কে তোমাকে ইয়া ইয়া চিঠি লিখছে ?'

'আমারই সব বন্ধুটন্ধুরা।'

'আরে, আমি তো দেখছি শিবুয়া পিয়ন প্রায়ই তোমার হাতে মোটা মোটা খাম গুঁজে দিয়ে যায় ! কত বন্ধু তোমার ! দেখো বাবা, ভেজাল জুটিয়ো না। এখানে এসে গেড়ে বসবে।'

'না।'

'না কী ! কলকাতার লোকদের তুমি চেনো না। একবার যদি গন্ধ পায় তুমি ফার্স্ট ক্লাস জায়গায় আছ, এখানকার জলে লোহা হজম হয়ে যায়—তা হলে আর রক্ষে রাখবে না ; রোজই দেখবে একজন করে হাজির হচ্ছে !'

'কেউ আসবে না।'

'ইন্দুদি, তোমার কোনো ধারণা নেই। ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভে দুটো অরিজিন্যাল মুর্গির ডিম, একটা ফ্রেশ ফুলকপি মাত্তর দেড় টাকায়, ক্ষেতির আলু, ভেড়ির নয় নদীর মাছ, আর এই শীত-শীত ভাব— ; কলকাতার লোকরা ভাবতেই পারে না। তাদের জিব দিয়ে জল পড়বে গো !'

রাজাকে আর বললুম না কেন তারা আসবে না। নন্দিতাদির চিঠির সে খবর রাখে না বোধ হয়। চিঠি আসে দেখেছে, কিন্তু কার চিঠি সে জানে না।

চার নম্বর চিঠির জবাব দেব কি দেব না করছি—একবার ভাবছি

দিই, কাগজ-কলম নিয়েও বসেছি, বসেও যেন কেমন বিরক্তি লেগেছে, রুক্ষ হয়ে উঠেছে মনের ভেতরটা, হাত গুটিয়ে নিয়েছি—এমন সময় আজকের চিঠিটা এল।

এবারের চিঠিটা বড় নয়, ছোট। নন্দিতাদি লিখেছে, আমি বুঝতে পারছি—তুই আর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাস না। বোধ হয় তোর সময়ও নেই চিঠি লেখার। এখন তোর কাছে আমরা বাইরের লোক, আমাদের নাম শুনলে তোর বিরক্তি হয় হয়ত, মন বিষিয়ে ওঠে। ভাবছিস, ভাবিস, আমরা কোথাকার সব আপদ, তোর গায়ে-মনে হুল ফোটাবার জন্যে উড়ে বেড়াচ্ছি।·· বেশ তো, অন্যদের কথা বাদ দে, আমি তোর সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিলাম, আমাকেই তুই যখন শত্রু ভাবলি, অবজ্ঞা করলি—তখন আর তোর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কী লাভ !....ইন্দু, তুই ভুল ভেবেছিস ! আমি তোর কাছে কৈফিয়ত চাইনি। আমি তোর মা না মাসি যে কৈফিয়ত চাইব ! তোকে শুধু মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, বেহুঁশ হোস না, নিজের মান-সম্মান নষ্ট করিস না। নিজেকে তুই হাসির খোরাক করলি—সেটাও তেমন বড় কথা নয়, তার চেয়েও বড় হল—তুই বোকার মতন যে আগুনে ঝাঁপ দিলি সে-আগুন কি তোর সইবে ? নাকি তোর সে বয়েস আছে ! মেয়েদের একটা বয়েস আছে, যে-বয়েসের পর তাদের বেলা পড়ে যায়। তুই এত পড়ন্ত বেলায় এমন করে মত্ত হবি কে জানত ! এটা হয় তোর মনের রোগ, নয়তো তোর ভেতরের লোভ।···ছি ছি, আমি ভাবতেই পারি না এমন কাজ তুই কেমন করে করছিস ? নেশার ঘোর লাগলে মানুষ সব ভুলে যায় সাদা কালো বোঝে না, মাটি জলে ভুল করে, পায়ের কাছে শুয়ে থাকা সাপ হাতে তুলে নেয়। তোরও সেই দশা হল। কথায় বলে, শয়তানরা মেয়েদের আগে ধরে। তোকেও শয়তানে ধরেছে। একদিন তোর নেশা ফুরোবে, শয়তান তোর মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নোংরা নষ্ট ঘেয়ো করে রেখে পালিয়ে যাবে। তখন তুই কাঁদবি ইন্দু। একলা বসে বসে কাঁদবি।

আমরা তোর কান্না দেখতে যাব না।....আমার আর কিছু বলার নেই। তোর কাছ থেকে আমি কোনোদিনই চিঠির জবাব চাইব না। চাই না।

'ইন্দুদি ?'

'উঁ !'

'কী হল ?···আজ কি উপোস ?'

'কই, না।'

'চিঠি হাতে বসে আছ তখন থেকে। কার চিঠি ?'

'আমার বন্ধুর।'

'কে বন্ধু ? তোমার সেই ফিনফিনে বন্ধুর ! চোখে গোল গোল চশমা পরে !'

'না। এ অন্য বন্ধু।'

'চিনি আমি !'

'দেখেছ। গোলগাল দেখতে। ফর্সা। কলেজে পড়ায়।'

'আচ্ছা ! সেই ভদ্রমহিলা ! গোলপার্কের নন্দিতাদিদি ! চুলে কলপ লাগায় ?'

তুমি কী করে বুঝলে চুলে কলপ লাগায় ?

'চুল দেখে। কলপী চুল দেখলেই বোঝা যায়। ভদ্রমহিলার মাথার এখানে ওখানে শুকনো খড়ের রং ধরে গেছে।

'যাঃ ! তুমি বড় ফাজলামি করো।'

'চলো, খিদে পেয়ে গেছে। একটা বাজতে চলল।'

'চলো।'

'আজ দুপুরে তুমি ঘুমোবে না।'

'কই আমি তো ঘুমোই না ; শুয়ে থাকি, বই পড়ি।'

'আমি তোমায় ঘুমোতে দেখেছি। দুপুরে তুমি ঘুমোবে, আর রাত্তিরে ঘুমের বড়ি খাবে—এ-সব চলবে না। ঘুমের বড়ি একটা নেশা। খেতে খেতে তোমার এমন অবস্থা হবে—একটা দুটো তিনটে

—তারপর একদিন আর চোখ খুলতে হবে না।'

'আমি কি রোজ বড়ি খাই ?'

'খেতে শুরু করেছ !··· আমি কিন্তু আর ঘুমের বড়ি কিনবো না।'

'বেশ।'

'বেশ নয়, আমার সাফ্ কথা।···তোমার শরীর এখানে এসে দারুণ ফ্রেশ হয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী হল যে ব্যাক্ গিয়ার মারলে!···না ইন্দুদি, তুমি পিছু হটতে পার না। খাও-দাও বেড়াও, হই-হই করো, আমার সঙ্গে লড়ে যাও—, চেঁচাও—আপনা থেকেই বাপ বাপ বলে ঘুম আসবে ঘুম মানে রেস্ট, আরাম। শান্তি।···বড়িটড়ি খেলে একটা আর্টিফিসিয়াল ব্যাপার হয়, জোর করে ঘুম পাড়ানো। আর্টিফিসিয়াল ব্যাপারটা ভাল নয়।'

'এত লেকচার শিখলে কোত্থেকে !···চলো, খেতে চলো।'

'আজ দুপুরে তোমাকে নিয়ে হাটিয়া যাব।'

'হাটিয়া ?'

'ওই তো—তেঁতুলতলার মাঠে।'

'পাগল ! দুপুরে আমি হাটেমাঠে ঘুরে বেড়াই।'

'দারুণ লাগবে। শীতের মিঠে রোদ, তেঁতুলতলার ছায়া, টাটকা কড়াইশুঁটির গন্ধ, ভুলুয়া বিস্কুটের ছাতু টেস্ট, একটা দুটো বাঁশরিঅলা···।'

'আর ?'

'আর ফেরার সময় আমি তোমাকে একটা পুরনো—মানে পুরাতনী গান শোনাব। বাঁশরি, বাঁশরি আমার হারায়ে গিয়াছে মেলার ভিড়ে। ··মেলার উচ্চারণটা হবে মে-লা-রো ! বুঝলে ?'

'বুঝলাম।'

॥ দুই ॥

নন্দিতাকে আমি কোনো চিঠি দিচ্ছি না। তার কাছে কৈফিয়ত দেবারই বা কী আছে আমার। আমি জানি, নন্দিতা আমার বন্ধু, আমি জানি তার স্বামী বিজনবাবু আমার স্বামীরও পরিচিত ছিলেন। সুবোধবাবু, কণিকাদি, অঞ্জলি, দত্তরায়—এদের সকলকেই আমি ভাল করে জানি-চিনি। ওদের মতন আরও অনেককে। আমি কি এতই বোকা যে, নন্দিতা যা লিখেছে সেটা শুধু তারই কথা বলে ধরে নেব? না, আমি তা ধরিনি। বিজনবাবু, সুবোধবাবু, কণিকাদি, অঞ্জলি— আর ওরা আরও পাঁচজনে একই কথা বলবে, নন্দিতা যা বলেছে।

ওরা বলবে। আগেও বলেছে. এখনও বলছে। পরেও বলবে।

বলুক ওরা। কিন্তু আমারও যে বলার কিছু কথা আছে। না, আমি কৈফিয়ত হিসেবে সে-সব কথা নন্দিতাদিদের বলতে যাচ্ছি না। কেন বলব! ওরা ওদের মতন ভাবুক, আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। ওদের ভাবনাকে আমি কি পাল্টাতে পারব? না, ওরা আমার কথা বুঝতে পারবে! যদি বা ওপর ওপর বোঝে, অনুভব করতে পারবে না। মানুষ নিজের কত কী অন্যকে অনুভব করাতে পারে না, চেষ্টা করলেও তার বারো আনা বাদ পড়ে যায়। আমিও সে-চেষ্টা করব না। তবে, এটা ঠিক, নন্দিতাদির চিঠি হালফিল এলেও আমি গত মাস কয়েক ধরে বুঝতে পারছিলাম, আমি অনেকের কাছে কৌতূহল আর বিরক্তির বস্তু হয়ে উঠছি। ওরা আমায় অবাক হয়ে দেখে, আমার কাণ্ডকারখানা দেখে ভীষণ বিরক্ত হয়। আমাকে ক্রমশই ওরা অপছন্দ করতে শুরু করেছিল। উপহাস করত। ঘেন্নাও করছিল। ওদের চোখ-মুখ থেকে যে 'ছি ছি কী হচ্ছে এত নোংরামি' —এই সব ধিক্কার খসে পড়ছিল তাও আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম।

কানে শুনি না-শুনি—আমি তো জানি মিসেস দত্তরায় আর সেন-গিন্নির মধ্যে আড়ালে কী কথা হতে পারে। একজন বলবে, 'বুড়ি মাগীর কাণ্ড দেখেছ! এই বয়েসে একটা কচি ছেলে জুটিয়ে তার মাথা খাচ্ছে, নিজেকেও খাওয়াচ্ছে! চোখে এ-সব দেখা যায়।' একজনের কথার পিঠে অন্যজন বলবে, লজ্জা শরমের কথা বাদ দিন, তার চেয়েও খারাপ—ওই বিধবা বিয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ বছরের বুড়িটার কী এত জ্বালা গায়েগতরে! ছুঁড়ি বয়েস হলে না হয় বুঝতাম, তোর তো যৌবনও শেষ, এখনও এমন যৌবনজ্বালা!' যৌবনজ্বালা! না যুবতীজ্বালা? ওরা বলতে পারত জ্বলুনি পুড়ুনি! এসব বিচ্ছিরি কথা কি ওরা বলতে পারে? ওরা সব ভদ্রসভ্য পরিবারের বউ, কেউ বা গিন্নি-বান্নি, বড় বড় ছেলেমেয়ের মা, কেউ চাকরি করে সরকারী অফিসে, কেউ স্কুল-কলেজে। একজন তো আবার মেয়ে উকিল। এরা সবাই ভাল করে ঘরদোর সাজায়, মানানসই শাড়িজামা পরে, মাঝে মাঝে স্বামীকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর বেলুড় যায়। এমন কথা কি ওদের মুখে মানায়!… হ্যাঁ, মানায়। কে বলেছে মানায় না? আমি ওদের ভাল করে চিনি। আড়ালে ওরা কত রকম কথা বলে, বলতে পারে আমি জানি।

নন্দিতাদির চিঠি তো হালে পেলাম। তার আগে থাকতেই আমি সব বুঝতে পারছিলাম। এরাই তো পাঁচ মুখ; এদের মুখই আমাদের সমাজের মুখ। এরাই আমাদের চারপাশের মানুষ। এদের কাছে কিন্তু আমি কোনো কৈফিয়ত দিচ্ছি না। নন্দিতাদির কাছেই যখন কোনো জবাবদিহি করছি না—তখন এরা কে?

তবু, আমি স্বীকার করব, এরা আমায় কম বিরক্ত করল না। নন্দিতাদি চিঠির পর চিঠি লিখে আমাকে অস্থির করে তুলল! কী বিরক্ত আর অসন্তুষ্টই না আমি হয়েছি! কিন্তু আমার মনের রাগ জ্বালা অসন্তোষ আমি তাকে জানাতে যাইনি। যাব না। তার কাছেও আমার কোনো জবাবদিহি নেই।

আমার জবাবদিহি নিজের কাছে। নিজের কাছেই মানুষ নিজের

কথা মন খুলে বলতে পারে। তার পাপ-তাপ সে স্বীকার করতে পারে। আমার দায় আমার নিজের কাছে, বিয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ বছরের বিধবা ইন্দু আজ যৌবনজ্বালায় জ্বলছে কি জ্বলছে না—সে-কথা আমি নিজেই বলি।

আমার নাম ইন্দুলেখা। ইন্দুলেখা বসু। বিয়ের আগে ছিলাম দত্ত। আমার স্বামীর নাম ধরিত্রীকুমার বসু। উনি আর নেই। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে উনি চলে গেছেন। এখন সবেই অগ্রহায়ণ। আমি বিধবা হয়েছি মাস ছয় হল।

আমার স্বামীর যাবার বয়েস হয়নি। ওঁর যে বড় কোনো রোগ ছিল তাও জানতাম না। অত্যাচার অনিয়ম করার মতন মানুষও উনি ছিলেন না। তবু একদিন জ্বরজ্বালা বাধিয়ে বসলেন। গরমের জ্বর ভেবে একটা বেলা কাটল। বিকেল থেকে জ্বর চড়তে লাগল হু হু করে। চার পাঁচ ছাড়িয়ে গেল। শরীর কাঠ। ডাক্তাররা বললেন, ভাইরাস ইনফেকশান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। একটা দিন যমে-মানুষে যুদ্ধ হল। পরের দিন সকালে উনি চলে গেলেন।

ওঁর দাহ কাজ করতে করতে বিকেল। শ্মশানে বিশ পঁচিশজন ছিল। আমিও ছিলাম। আর ছিল রাজা, রাজেন, যাকে নিয়ে আজ এত কথাবার্তা।

নিজের কথা গোড়া থেকে সামান্য বলি।

আমার জন্ম দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়ে। তখন চারদিকে আগুন জ্বলছে। বোমা পড়ছে, মানুষ খুন হচ্ছে, কে কখন বিপদের মুখে পড়ে তার ঠিক নেই। অমন অবস্থায় বাবা কোনো ঝুঁকি নেননি। মাকে আমার মামার বাড়িতে রেখে এসেছিলেন। তাছাড়া বাবার ছিল বদলির চাকরি। আমি মামার বাড়িতে জন্মেছি। চন্দননগরে।

একেবারে ছেলেবেলার কথা আমার ভাল মনে নেই। শুধু মনে

আছে আমার যখন তিন-চার বছর বয়েস তখন আমার আর একজোড়া ভাই-বোন এসেছিল। যমজ। বাবা তখন হাওড়ার দিকে থাকেন।

মা আমাকে ঠাকুমার জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে নতুন ছেলে-মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল! কী বা করবে মা! কচি দেখার জন্য অন্য লোক কই! বাবা যেবার হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেলে বদলি হল আমার জোড়া ভাই-বোনের একজন মারা গেল। ভাই গেল। বোন থাকল। বাড়িতে কান্নাকাটি হল ক'দিন। আবার সব শান্ত।

আমার যখন ন-দশ বছর বয়েস বাবার বদলি হল আসানসোলে। আমি এখনও একটু একটু আমাদের বাড়িটা মনে করতে পারি। ছোট বাড়ি, কিন্তু একেবারে একটেরে। বাড়িটা ছিমছাম ছিল। বাড়ির সামনে ছোট্ট জায়গাটুকুতে দোপাটি গাঁদা বেলফুলের বাগান করত বাবা। একটা দোলনাও টাঙিয়ে দিয়েছিল। এখানে আবার এক ভাই হয় আমার। হতে না হতে মারাও যায়।

আমার মায়ের শরীর-স্বাস্থ্য খারাপ ছিল না, তবু কেন এরকম হত কে জানে! তা আমাদের বাড়িতে আর কোনো বাচ্চাকাচ্চা আসেনি। আমি আর আমার বোন—বিন্দুই ছিলাম। বিন্দুর ভাল নাম ছিল, বিনতা।

আমাদের লেখাপড়া আসানসোলেই। আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না ওদিকে। চন্দননগর থেকে মামারা ডাকত একটা ঘরবাড়ি করতে। বাবার টান ছিল কলকাতার ওপর। আমি যে-বছর কলেজে ঢুকি সেই বছর টালিগঞ্জের দিকে খানিকটা জমি কেনেন। বাবার এক বন্ধুই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

আমাদের টালিগঞ্জের বাড়ি শেষ হতে হতে বাবা রিটায়ার করলেন। ঠাকুমা অনেক আগেই মারা গিয়েছে। বাবা মা, আমি আর বিন্দু—এই নিয়ে আমাদের সংসার। অবসর জীবনে চুপ করে বসে না থেকে বাবা কিছু খুচরো কাজকর্ম করতেন। মায়ের সেটা ভালই লাগত।

কেননা চুপ করে বসে থাকলে শরীর মন ভেঙে যায়, মেজাজ খিটখিটে হয়ে ওঠে।

কলেজ শেষ করেছি কি করিনি আমার বিয়ে নিয়ে বাড়িতে কথা হতে শুরু হল। আগেও হত, তবে অতটা জোর গলায় নয়। বি-এ পরীক্ষা দেবার পর থেকেই দেখি মা-বাবা কাগজ ঘাঁটছে। বিন্দু এখানে ওখানে টিক মারছে, দেখছে কোনটা সুপাত্র, কার কত আয়, কে কী করে। মা চেনাজানার মধ্যে বলা-কওয়া শুরু করল।

বিয়ের পাত্র জোটার আশায় মা-বাবা বসে থাকল, আমি ভর্তি হলাম যাদবপুরে।

বিয়েটা বোধ হয় সত্যিই ভাগ্য। আমার নিজের বেলায় তো বটেই অন্য অনেক মেয়েদের বেলায়ও তাই দেখলাম।

দু দুবার আমার বিয়ের কথা মাঝপথ পর্যন্ত এগুলো। তারপর ভেঙে গেল। টাকাপয়সা একটা কারণ হয়ত, অন্য কারণও আছে। উভয়পক্ষই কোনো এক জায়গায় গিয়ে আর এগুতে পারছিল না।

আমার পড়ার পাট চুকল। আর এমনই কপাল মা সেই বছরই চলে গেল।

আমি হলাম বাড়ির বড়। বাবাকে দেখি, বোনকে দেখি। বোনও তখন কত বড়, কলেজ শেষ করে ফেলছে।

বিন্দু খানিকটা হই-হল্লা করে থাকতে ভালবাসত। সে গানটানও শিখেছিল। তার বন্ধুবান্ধব ছিল অনেক। থিয়েটার-নাটক করতে পারত।

একদিন বিন্দুর এক বন্ধু এসে চুপিচুপি আমার হাতে চিঠি গুঁজে দিয়ে গেল।

চিঠি পড়ে আমি থ।

চিঠিটা বিন্দুকে দিয়ে বললাম, পড়!

বিন্দু বলল, সে জানে।

বুঝলাম পরামর্শ করেই চিঠিটা লেখা।

বোনের চোখ-মুখ সবই বলে দিচ্ছিল। তবু বললাম, তুই সত্যিই ওই পুলকেশকে বিয়ে করবি ?

বিন্দু লুকোচুরি না করে বলল, হ্যাঁ।

বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে একটা জড়তা ছিল। কেন জানি না। বিন্দু যেভাবে বাবার সঙ্গে কথা বলত, হাসি-তামাশা করত—আমি পারতাম না। যদিও আমি বড় মেয়ে।

নিজের বিয়ের বেলায় বিন্দু আমাকে দিয়েই কথাটা তোলালো।

বাবা রাজি হতে চাইছিলেন না। বড় বোন পড়ে থাকতে ছোটর বিয়ে কেমন করে হয়।

আমি বাবাকে বোঝালাম, পুলকেশ ভাল ছেলে, সে বাইরে চলে যাচ্ছে—বিদেশে, এই বিয়ে না হলে আবার সে কবে আসবে, কী হবে —কেউ বলতে পারে না। ও তো বিন্দুকে নিয়েই চলে যেতে চাইছে।

বাবা রাজি হয়ে গেলেন।

বিন্দুর বিয়ে হয়ে গেল। সে চলে গেল পুলকেশের সঙ্গে বাইরে, নাইজিরিয়ায়। পুলকেশ সেখানে গিয়েছে এঞ্জিনিয়ার হয়ে।

বাবা আর আমি।

মা মারা যাবার পর থেকেই আমার বিয়ের কথাটা থমকে গিয়েছিল। বিন্দু চলে যাবার পর বড় রকমের একটা ছেদ পড়ে গেল। বাড়ি বড় ফাঁকা। বাবাকে কে দেখবে ? বয়েস বাড়তে বাড়তে বাবাও তো বুড়ো হতে চলল ; তারপর শরীরটাও ভেঙে গিয়েছে।

এই সময় আমি একটা চাকরি জুটিয়েছিলাম। সাধারণ চাকরি। খানিকটা কেরানির, খানিকটা কমর্শিয়াল লাইব্রেরি দেখার।

আমার বয়েস বাড়তে বাড়তে তিরিশ ছাড়িয়ে গেল। একত্রিশ, বত্রিশ।

বত্রিশ বছর বয়েসে আমার বিয়ের ফুল ফুটল। বাবা তখন জানেন না, বড় মেয়ের বিয়ের চার মাস পরে তিনি ক্যান্সারে মারা যাবেন।

বাবা মারা গেলেন। আমাদের টালিগঞ্জের বাড়ি বিক্রি করে

আমরা দুই বোনে টাকাপয়সা নিয়ে নিলাম। বিন্দুর টাকা জমা থাকল কলকাতার ব্যাঙ্কে।

আমার বিয়ের আগে পর্যন্ত যা বলার—বলা শেষ হল। ও-পর্ব ফুরলো।

॥ তিন ॥

বিয়ের পর আমি এলাম হরিশ মুখার্জি রোডে। পুরনো দিকটায়। আমার স্বামী ধরিত্রীকুমার বসুর একটা ব্যবসা ছিল; 'কনক কেমিকো ইণ্ডাষ্ট্রীজ।' কনকবালা শাশুড়ির নাম। তিনি ছিলেন না, তাঁর নামটা ছিল। স্বামীর রসায়ন কারখানায় কী কী তৈরি হত তার খোঁজ আমি রাখিনি। রেখে লাভ হত না। কয়েকটা নাম শুধু শুনতাম; সোডিয়াম ডাইক্রোমেট, সোডিয়াম অ্যালুমিনেট, ব্লিচিং পাউডার, সোডা অ্যাশ, পটাসিয়াম ক্লোরাইড—এই রকম আরও কত। আমার কাছে সোডিয়াম পটাসিয়ামে কোনো পার্থক্য ছিল না।

'কনক কেমিকো ইণ্ডাষ্ট্রীজ'-এর কারখানা ছিল খিদিরপুরে। অফিস ছিল বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিটে। আমার স্বামী দু জায়গাতেই আসা-যাওয়া করতেন। তবে অফিসেই থাকতেন বেশি সময়, কারখানা দেখাশোনার দশ আনা করত ওঁর পার্টনার গণেশ সামন্ত।

আমাদের বিয়েটা প্রায় আচমকাই হয়েছিল। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বাবা একটা চিঠি লিখেছিলেন। আমি জানতাম না। মাস-খানেক পরে তার জবাব আসে। তারপর বাবা একদিন ধরিত্রীকুমারের বাড়িতে দেখা করতে যান। ফিরে এসে আমায় বলেন কথাটা। সপ্তাহখানেক পরে দুই ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে এলেন। বাবা তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আমার। একজন পরে হলেন

আমার স্বামী, অন্যজন স্বামীর দূর সম্পর্কের ভাই।

বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে আমার প্রথম কথাবার্তা হল ফুলশয্যার দিন। সকলেরই হয়ত তাই হয়। কিন্তু সকলের সঙ্গে আমাদের একটু পার্থক্য ছিল। যাকে ঠিক ঠিক ফুলশয্যা বলে তা আমাদের হয়নি। না হবার কারণ পারিবারিক এক সংস্কার। ওঁদের পরিবারে মর্মান্তিক এক ঘটনা ঘটেছিল। আমার স্বামীর কাকা ছিলেন এঞ্জিনিয়ার। জার্মানি থেকে ফিরে আসার পর ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। বিয়ের পর ফুলশয্যার দিন রাত্রে ওঁর মাথায় যন্ত্রণা হতে শুরু হয়, যন্ত্রণা বাড়তে বাড়তে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। দিন চারেকের মাথায় হাত-পা অসাড়, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, কথা অস্পষ্ট—জড়ানো। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর জানা গেল, ব্রেন টিউমার। উনি মারা গেলেন দিন পনেরোর মধ্যেই।

বিশেষ শুভদিনে এমন অশুভ ঘটনা ঘটে যাবার পর থেকেই সাবেকি ফুলশয্যা বন্ধ হল এ-পরিবারে। আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের পর্ব যেটুকু থাকল সেটুকু খুবই মামুলি। মোট কথাটা এই, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে যখন আলাপ পরিচয় শুরু করলাম তখন আমাদের বিছানায় কোনো ফুল ছিল না, কোনো সাজসজ্জা নয়, এমনকি আমাদের শোবার খাটও নতুন নয়। বিছানাটা অবশ্য নতুন ছিল। আর নতুন ছিলাম আমরা।

আগেই বলেছি, বিয়ের সময় আমার বয়েস ছিল বত্রিশ। আমার স্বামীর বয়েস আটত্রিশ। বছর ছয়েকের ছোট-বড় ছিলাম আমরা। বয়েসের তুলনায় স্বামীকে আরও খানিকটা বড় দেখাত। মনে হত, চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছেন। ওঁর চেহারায় ঠিক কোথায় বয়েস ধরে গিয়েছিল তা আমি বলতে পারব না। মানুষটির গড়ন ছিল চেটালো। মাথায় লম্বা। হাত-বুক যেন চ্যাপটানো, চওড়া চেটালো হাড়ের জন্যেই বোধ হয় ওই রকম দেখাত। মুখ চওড়া, গালের হাড় স্পষ্ট, নাক এক রকম লম্বাই। মাথায় চুল কমই ছিল। তবে সাদা হয়নি কোথাও। চোখ দুটি কেমন যেন অন্যমনস্ক, নিরুজ্জ্বল ছিল। ওঁর

ডান গালের পাশে একটা জায়গায় নীলচে দাগ গিয়েছিল। কেন আমি জানি না। সব সময় একটু কুঁজো হয়ে থাকতেন, হাঁটতেন উনি, ওই-ভাবেই। গলার স্বর ছিল মোটা। তবে কর্কশ নয়। এক কথায় আমার স্বামীকে দেখলে ব্যবসায়ী না হোক কাজের মানুষ বলেই মনে হবে।

আমার কথাও এখানে বলা দরকার একটু। নামে ইন্দু হলে আমার মধ্যে চাঁদের ছিটেফোঁটাও ছিল না। গায়ের রং আমার ময়লা। গড়ন ছিপছিপে। গলা সামান্য লম্বা। মুখচোখ সাধারণ। মা আমার চোখের গুণগান গাইত, বলত—টানাটানা চোখ, কুচকুচে কালো মণি। মায়েরা অমন বলেই থাকে। আমার বোন বিন্দু বলত, আমার থুতনি নাকি কাটাকাটা। কোমর হাল্কা। তা এ-সব বোনের কথা। এর কতটা সত্যি তা আমি জানি না। হয়ত গোটাটাই তার মনে মনে বানানো। তবে হ্যাঁ, আমার মাথার চুল নিয়ে আমি গর্ব করতে পারতাম। অঢেল চুল ছিল আমার। আর একটা জিনিস আমার ছিল, হাতের নোখগুলো লাল। প্রায় টকটকে লাল। পায়ের নোখ অত লাল ছিল না।

স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হল মামুলিভাবে।

'কী গরম!··হপ্তাখানেক বৃষ্টি নেই।' স্বামী বললেন।

আমাদের বিয়ে হয়েছিল বৈশাখের শেষে। তখন কালবৈশাখীর সময়। দু চারবার ঝড়ঝাপটা ভালই হয়েছে। বৃষ্টিও এক-আধ পশলা।

'তোমার বাবাকে নগেন বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছে গাড়ি করে।'

'যাবার আগে দেখা হয়েছে আমার সঙ্গে।'

'ওঁকে আজ খুশিখুশি লাগছিল। গণেশের সঙ্গে অনেক গল্প করছিলেন।'

বাবাকে তো খুশিখুশি দেখাবেই আজ। কত বড় দায়মুক্ত হলেন।

'তোমার বোনের একটা টেলিগ্রাম এসেছিল না?'

'পেয়েছি।'

'ওরা কি পরে আসছে ?'

'না। এখন নয়। হয়ত আসছে বছরের শেষে…'

'তোমার বন্ধুরা এসেছিলেন ?'

'বন্ধু আমার কম। দুজন দেখা করতে এসেছিল।...কাছাকাছি থাকে তারা।'

'আসলে আমাদের তরফ থেকেই বলা দরকার ছিল। কিন্তু আমরা —আমাদের ফ্যামিলিতে এই অকেশানটা সেভাবে হয় না কিনা !'

'তাতে কী !,

'…তুমি কি পান খাও ?'

'খেয়েছি একটা।'

'আমি একটা খাই।...রিচ্ খাওয়া-দাওয়া হলেই আমার একটা অস্বস্তি হয়। ...আর একটা পান খাবে ?'

'খাই।'

আমার স্বামী খাটে বসলেন। পানের মুখে সিগারেটও ধরানো হল। 'পরশু আমরা পুরী যাচ্ছি। দিন চারেক থাকা যাবে। আমার আবার এই সময়টা বড় ঝঞ্ঝাট যাচ্ছে। কাজ তো আছেই, তার ওপর একটা লাইসেন্স নিয়ে ছোটাছুটি করছি।...তুমি আরাম করে বসো, ইন্দু।' সেই প্রথম আমার নাম ধরে ডাকলেন।

'বসছি। অ্যাশট্রে এনে দিই।'

'দরকার নেই। দু এক টুকরো ছাই মেঝেতে পড়বে—পড়ুক। সিগারেট আমি বেশি খাই না। একটু পরেই ফেলে দেব।…বলছিলাম, তোমার বাবার ব্যবস্থাটা কী হল ? একলা মানুষ।'

বাবার ব্যবস্থা আগেই করা হয়েছিল। বললাম।

দু পাঁচটা এলোমেলো কথা। তারপর স্বামী বললেন, 'তুমি কি চাকরিটা করবে ? না, ছেড়ে দেবে ?'

'যা বলো !'

'না, আমাদের বাড়িতে তো লোক নেই। আমরা দুজন। আর ওই

মণিপিসি। তা পিসি এবার একটু ছুটি চায়। বর্ধমানে দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকবে মাস দুই। সেখান থেকে যাবে কাশী মথুরা বৃন্দাবন। বুড়িদের যা হয়—তীর্থ করার শখ।···তুমি চাইলে চাকরি করতে পার। তবে বাড়িতে শুধু কাজের লোক—তোমাকে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে হবে।'

'ভেবে দেখি।···আমার তো সময় কাটাবার জন্যে চাকরি।'

'সময় কেটে যাবে। মানে, সংসারে জড়িয়ে পড়লে···। তুমি ভাল করে পা তুলে বসো না!··শোবে? ক'টা বাজল? সাড়ে বারো। শুয়ে পড়তে পার।'

আমাদের শুতে শুতে একটা বাজল।

ঘর অন্ধকার হলে আমরা পাশাপাশি শুয়ে কে যে কী ভাবছিল কে জানে! হঠাৎ আমার গা শিরশির করে উঠল। বুকের কাছে অকারণ কী যেন কাঁপল, পায়ের দিকটা ঠাণ্ডা লাগল। থর থর করে উঠল হাঁটুর ওপর দিকটা।

'ইন্দু?'

'উঁ।'

'আমি একসময় বিয়ে-টিয়ের কথা ভাবতাম না। বোধ হয় একটু দেরিতেই ব্যাপারটা হল।'

'···কেন?'

'আমার কিছু মনে হচ্ছে না। এরকম কত হয়! আমার নিজেরই তো কত বয়েস হল।'

'আঃ! আজকাল মেয়েদের এসব হয়। ভেবো না।···আমরা ঠিক আছি। বরং আমি একটু বেঠিক।' স্বামী হাসলেন। হাসি থামার পর তার বাঁ হাতটা আমার গায়ে ছোঁয়ালেন। পাশ ফিরলেন।

'আমাদের এই বাড়ি, ঘর, যা কিছু আছে আমাদের—এখন থেকে সবই তোমার হাতে। তোমার জিম্মায় আমরা থাকলাম। তুমি নিজের মতন করে নিয়ে থাকবে। তুমি সুখী হয়েছ দেখলে ভাল লাগবে।'

আমি অনুভব করলাম ওঁর হাত আমার হাত খুঁজছিল।

একজন মানুষকে বুঝতে সময় লাগে। কখনো কখনো অনেক সময়। আমার বিয়ের পর স্বামীকে বুঝতে চেষ্টা করার মুখেই বাবার অসুখ করল। আর সে অসুখ ভয়ঙ্কর। বাবার জন্যে আমার ছোটাছুটি করতে হত, থাকতে হত বাবার কাছে গিয়ে, ডাক্তার হাসপাতালও আমার ঘাড়ে। স্বামী আমার সুবিধের জন্যে তাঁর লোকজন পাঠিয়ে দিতেন। তারা আমায় সাহায্য করত।

বিন্দু বড় অদ্ভুত মেয়ে। বাবার অসুখের খবর পেয়ে সে চিঠি লেখা ছাড়া আর কিছু করল না. একবার কিছু টাকা কলকাতায় বসেই বাবা পেলেন। একজন এসে দিয়ে গেল বিন্দুর নাম করে।

বাবা মারা গেলেন চার মাসের মাথায়।

টালিগঞ্জের ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করতে করতে আরও মাস ছয়।

আমার স্বামীর আর সংসারের ওপর পুরোপুরি নজর দিতে পারলাম বাবা মারা যাবার পর। আর তখন থেকেই বুঝতে পারছিলাম, কোথায় যেন একটা ভুল থেকে যাচ্ছে। সেটা যে কী, কেমন করে শোধরানো যায় তা আমার মাথায় আসছিল না।

অবশ্য দু তরফেই পর পর একটা ব্যস্ততা ও অ-মনোযোগ এসে গিয়েছিল। আমি আমার বাবার জন্যে এতই উদ্বিগ্ন, ব্যস্ত থাকতাম যে স্বামীর জন্যে বেশি সময় দিতে পারতাম না। বাবার তখন যা অবস্থা—যে কোনো সময়েই চলে যেতে পারেন। কী কষ্টই না পেতেন তিনি, যন্ত্রণায় ছেলেমানুষের মতন কাঁদতেন। বাবাকে তখন ফেলে রেখে স্বামীর ওপর চোখ দেবার অবসর আমার কম ছিল। যে-মানুষটা বরাবরের মতন চলে যাচ্ছে—একমাত্র অবলম্বন হয়ে কেমন করে সেই মানুষকে সরিয়ে রাখব। বাবা চলে গেলেন। আমিও নিশ্চিন্ত।

আমার স্বামীকেও দেখলাম, এই সময়—কারখানা, অফিস, লাইসেন্স ইত্যাদি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। কারখানায় আগুন লেগে গিয়েছিল, ক্ষতি

হল যথেষ্ট ; অফিসের ঘরে রামদুলাল বলে এক বেয়ারা গলায় দড়ি দিয়ে মরল, তাই নিয়ে হাঙ্গামা হুজ্জত, আর কিসের লাইসেন্স নিয়ে মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়াল। সোজা কথা স্বামী তখন নিজেই এত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন যে আমি তাঁকে আমার আওতার মধ্যে পেতাম না।

বিয়ের প্রথম বছরটা এইভাবেই কাটল।

চার

শোকতাপ, দুর্ভাগ্যের মেঘগুলো নাকি চিরস্থায়ী হয় না। হয়ত নয়। বাবা চলে যাবার পর আমি ধীরে ধীরে নিজেকে গুছিয়ে নিলাম। আমার স্বামী যেসব আকস্মিক ঝঞ্ঝাট ও অসুবিধেয় পড়েছিলেন—সেগুলো সামলে উঠতে মাস কয়েক সময় নিলেন, তারপর তিনিও আর সারাক্ষণ উদ্বেগ নিয়ে থাকতেন না।

স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আমরা তখন নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে আর ব্যস্ত নই, বিব্রত নই। নিজেদের ঘনিষ্ঠতম করার কোনো বাধাই আর তখন ছিল না। তবু কোথায় যে কী ঘটছিল কে জানে!

আমার স্বামীর স্বভাব ছিল শান্ত। তাঁর সমস্ত ব্যাপারেই কেমন জড়তা ও দ্বিধার ভাব ছিল। অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন। খুঁতখুঁতে। ভীতু ধরনের। শুনতাম, তিনি অনেক সময় অফিসেও অকারণে ভীত হয়ে উঠতেন। বাড়িতে তাঁকে দেখতাম, ভীষণ শিথিল, হাত-পা ছাড়া। অথচ তিনি অলস ছিলেন না।

আমাদের হরিশ মুখার্জির বাড়িটা ছিল দোতলা। পুরনো। সামনে পঁচিশ ত্রিশ হাত বাগান। সিঁড়ি উঠে সামনে হলঘর। ডাইনে 'কনক কেমিক্যাল' একটা ছোট অফিস মতন। তার পেছনে ছিল ছোট গুদোম। কারখানার কিছু কিছু মাল এখানে এসে জমা হত। বাড়ির সামনে

বাগানে কিছু গাছপালা ছিলঃ টগর, শিউলি, পাতাবাহার, দু চারটে বেলফুলের বড় বড় টব। আর ছিল ক্যাকটাস।

হলঘর পেরিয়ে আমাদের অন্দরমহল। নিচে রান্নাবান্না, ভাঁড়ার, পারুলের মা, মুকুন্দ আর গোপেন থাকত। দোতলায় আমরা।

দোতলায় আমাদের তিনটে ঘর। উত্তরে বাথরুম। তিনটে ঘরের একটা ছিল শোওয়ার ঘর। অন্যটায় আমরা বসতাম। শেষের ঘরটা খালিই পড়ে থাকত। ও ঘরে কয়েকটা আলমারিতে বই ছিল নানা রকম, এমন কি আমার স্বামীর কলেজে পড়ার সময় কেনা রসায়ন বইও। বই ছাড়া ওঘরে আমার শ্বশুরমশাইয়ের গুরুদেবের বড় একটা রঙিন ছবি, দু-চারটে পাহাড়-পর্বতের ছবি। একটা পুরনো তানপুরা, সেকেলে গ্রামোফোন, রেকর্ডের বাক্স।

দোতলার ঢাকা বারান্দার বাইরের দিকে কাঠের জালির আড়াল ছিল। ওখানে খাবার টেবিল, চেয়ার, একপাশে ফ্রিজ, এমন কি দু-চারটে সাজগোজের জিনিস।

আমার সকাল শুরু হত সাতটা নাগাদ। চাকরি আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। সকাল শুরুর পর কোনো তাড়া ছিল না। ধীরেসুস্থেই সংসারের কাজকর্ম চলত। আমার স্বামীর অভ্যেস ছিল, চা মুখে নিয়ে কাগজ মুখস্থ করা, আমি তো তাই বলতাম, একটা ইংরিজি আর একটা বাংলা কাগজ নিয়ে প্রায় বেলা ন'টা বাজিয়ে দেওয়া। ন'টার পর একবার নিচে নামতেন, 'কনক কেমিকোর' অফিসে, শৈলেন এলেই উঠে আসতেন ওপরে। দাড়ি কামানো, স্নান, খাওয়াদাওয়া সেরে সাড়ে এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে যেতেন বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের অফিসে। কোনোদিন বা কারখানা ঘুরে অফিস যেতেন।

বাড়িতে আমি একা। একা মানে পারুলের মা-টাদের বাদ দিলে একা।

দোতলায় শুধু ঘরদোর পরিষ্কার করি, আলমারি খুলে বসে একটা বার করি অন্যটা তুলি, দু চুমুক চা খাই, কখনো রেডিয়ো খুলি বন্ধ করি,

সোফাসেটের কুশন পাল্টাই, বইয়ের আলমারি খুলে পুরনো বইগুলো দেখি, পাতা ওল্টাই। দোতলার বারান্দায় রোদ সরে যায়, ভোমরা এসে জোটে, কোনো কোনোদিন শেতল ধোপা, গাঁটরি নামায়, কাপড়-চোপড় দেয়, ময়লা কাপড় নেয়, সে তার বউয়ের গল্প করে—কচিবাচ্চা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, বড় মেয়েটার জ্বরজ্বালা, বউয়ের কাশি।

দুপুরে আমি বই পড়ি, শুয়ে থাকি, চোখ লেগে যায় নিজেদের ছেলেবেলার কথা ভাবি, মা বাবার কথা মনে পড়ে, বিন্দুকে আর চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে না, সে আমাকে ভুলে গেছে। তার ছেলে বার কয়েক আমাকে 'আন্টি' বলে ইংরিজিতে চিঠি লিখেছে।

যখন আর চুপচাপ থাকতে পারি না, নন্দিতাদিকে ফোন করি। নন্দিতাদিকে না পেলে দীপাকে।

দীপাও আমার বন্ধু। তার স্বামী খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করে। দীপা চাকরি করে লাইফ ইনসিওরেন্সে। মেয়ে মহলে তার নাকি নাম হয়েছে। কাগজে মাঝে মাঝে গরম গরম লেখা লেখে। আমি মনে মনে ভাবি। যে-মেয়ে স্বামীর মাইনের টাকা নিজের হাতে গুনে নেয়, যে তার স্বামীর হাতের একটা দামী পাথরের আংটি হারানোর জন্যে ফ্ল্যাটবাড়ি তোলপাড় করে দিয়েছিল তার কলমে অত গরম গরম লেখা আসে কেমন করে?

বিকেল নামত; মাঝে মাঝে দেখতাম বাড়ির সামনে টেম্পো এসে দাঁড়িয়েছে, হয় কোনো মাল নামছে, না হয় উঠছে 'কনক কেমিকোর' বাড়তি গুদোম থেকে, শৈলেন নিচের তলায় উঠোনে দাঁড়িয়ে। কখনো সখনো শৈলেন আমার কাছে টাকা ভাঙানি নিতে দোতলায় আসত। বলত, 'বউদি, আমি পরে আপনাকে ভাঙানি এনে দেব।' কোনোদিন আনত বলে মনে পড়ে না। তবে কদাচিৎ সে ওপরে আসত বিনি কাজে, বা আমি নামতাম নিচে। তখন গল্পটল্প করত খানিক। আমি ওর কাছেই শুনলাম, বাড়ি থেকে যে সব মাল যায় তার চালান আলাদা, রসিদ আলাদা। সেই চালান আর রসিদের মাথায় আমার নাম থাকত

'ইন্দু এজেন্সি।'...ব্যবসায় কত' ফন্দিফিকির।

আমার স্বামীর বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে।

সন্ধের আগেই আমার গা-ধোওয়া, চুল বাঁধা শেষ। শাড়ি জামা পালটে একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্বামী ফিরে বাথরুমে ঢুকলেন, তিনি প্যান্ট-জামা পালটে খাবার টেবিলে আসার আগেই আমি চা জল-খাবার নিয়ে বসে আছি।

তখন নানান রকম কথা হত। সবই প্রায় সাধারণ। আজকাল মাছে কোনো স্বাদ থাকে না, সর্ষের তেলের চেয়ে রেপসিডটা ভাল, আবার কলকাতায় একটা বন্‌ধ হতে চলেছে, মন্ত্রীরা কথা বলার সময় ভেবেও দেখে না কী বলছে, কী রকম ভূমিকম্পটা হয়ে গেল বাইরে দেখেছ, আজকাল ডাক্তাররা বলছে অ্যাসপিরিন হার্টের পক্ষে ভাল... এই সব সাধারণ এলোমেলো কথা থেকে স্বামীর অফিসের কথা, ব্যবসার অবস্থা একই রকম থেকে যাচ্ছে ইত্যাদি।

ওরই মধ্যে এক আধদিন নিজেদের কথা উঠত।

'তুমি একবার চোখটা দেখিয়ে নাও। ক্রনিক মাথাধরা চোখের জন্যেই হতে পারে। কাকে দেখাবে?'

'দেখি'।

'দেখাদেখির কী আছে! তোমার বন্ধু নন্দিতার সঙ্গে কথা বলো। উনি তো চশমা পরেন। ওঁদের যদি কোনো চেনা ভাল ডাক্তার থাকে—।'

'তোমারও তো চশমা আছে।'

'আমার ডাক্তার ছিল নন্দী। ভাল ডাক্তার। উনি কলকাতা ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন চাকরি নিয়ে। গভর্নমেন্ট সেণ্টাল হসপিটালে।'

'দেখি, একদিন নন্দিতাদির সঙ্গে যাব।

'তোমার কি মাইগ্রেন আছে?'

'কই! বুঝি না।'

'...পাজি অসুখ।.. কাল একটা লোক আসবে। তুমি চেনো না
আমি বাড়ি থাকতে থাকতে যদি আসে ভাল কথা, যদি পরে আসে—
শৈলেনের কাছেই আসবে। লোকটা ভাল রং-মিস্ত্রি। ঘরদোর স
দেখাবে। দরজা জানলাও। এবার একবার রং করে নেওয়া দরকার
আগের বারে কাজটা ভাল হয়নি।'

'রং তো নষ্ট হয়নি।'

'তিন বছর হতে চলল। ফেড্ হয়ে গেছে...'

আমার স্বামীর ঘরবাড়ির ওপর নজর ছিল। ভাঙাচোরা দেখলে
সারিয়ে নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। দরজা জানলার একটা কব্জা
কি ছিটকিনি খুলে গেলে তাঁর কী অস্বস্তি। বছর দুই আড়াই অন্তর
বাড়ি রং হত।

আমি কি আমার স্বামীকে ঠাট্টা করছি? বলতে চাইছি, উনি
বাইরের রং-টাই বুঝতেন, ভেতরের নয়?

না, ঠাট্টা নয়। বাড়ির ওপর যেমন, ব্যবসার ওপর যেমন—তেমনি
বাড়ির এই মানুষটার ওপরও তাঁর নজর ছিল।

'ইন্দু, একটা পুরনো গাড়ি পাচ্ছি। নেবে নাকি?'

'গাড়ি?'

'তুমি একটু ঘোরাফেরা করতে পারবে।'

'আমি কোথায় ঘোরাফেরা করব!'

'বেড়াতে-টেড়াতে যেতে। কোনোদিন থিয়েটার সিনেমা বাজার
...বন্ধুটন্ধু।'

'তোমার দরকার লাগলে নাও; আমার লাগবে না।'

'...ইয়ে, তুমি দিন কয়েক বেড়িয়ে এসো না!'

'আমি?'

'ওই যে তোমার বন্ধুরা যাচ্ছেন—কণিকারা। ওঁদের সঙ্গে হরিদ্বার
মুসৌরি ঘুরে আসতে পার।'

'ঘরবাড়ি?'

'মুকুন্দরা দেখবে। আমি থাকছি।

'সারাদিন বাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকবে।

'না, তেমন কই! নিচে ওরা আছে। শৈলেনও থাকছে দুপুরে।'

'থাক্‌। এই আমার ভাল।'

'তুমি বোধ হয় খুব বোর হয়ে যাচ্ছ!...কী করব, আমি একেবারে হাত-পা বাঁধা হয়ে গিয়েছি। ব্যবসার চেয়ে চাকরি ভাল। নিজের কোনো ঝক্কি থাকে না। লোকে হাত-পা ছড়াতে পারে। আমাদের হল ছোট ব্যবসা। সব নিজেকে দেখতে হয়, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। কারখানা দেখো, টাকার জন্যে ব্যাঙ্কে ছোটাছুটি করো, অর্ধেক কাস্টমার বিল আটকে রেখে দেয়, তাদের কাছ থেকে টাকা আদায়, তারপর মালমশলা জোগাড়, নতুন পার্টি খোঁজা, সেলস ট্যাক্স...। পারা যায় না।

'গণেশবাবু?'

'গণেশ কারখানাটা সামলায়। ওটাও তো আজকাল ট্রাবল্‌ড স্পট। তার ওপর গণেশ সেলস-টাও দেখে...।'

আমার স্বামী কাজের মানুষ। ছুটিছাটা কই, হাত-পা নাড়ার সময় কই, তবু তিনি আমাকে দুবার দীঘা, একবার দার্জিলিং নিয়ে গিয়েছিলেন। দু চার মাস অন্তর আমরা হয় দক্ষিণেশ্বর যাই, যা হয় বেলুড় মঠ। একবার বিষ্ণুপুরও গিয়েছিলাম।

আমার দিন এইভাবে কাটতে কাটতে সবই সয়ে গিয়েছিল। বাবার কাছেও যখন থাকতাম তখন কি আমার সময় অন্যভাবে কেটেছে? না। প্রায় একইভাবে। উনিশ বিশ তফাত। বাবার কাছেও আমি অনেকটাই একলা একলা ছিলাম। স্বামীর কাছেও তাই।

রাত্রে আমার সঙ্গে ওঁর—আমার স্বামীর কি ব্যবধান থাকত? না। আমরা মস্ত জোড়াখাটে শুতাম। বিছানা নরম, ধবধবে; বালিশে মাথা ডুবে থাকত আমাদের, ওঁর ও-পাশে এ-পাশে পাশবালিশ। এক একদিন মাঝের পাশবালিশ সরে যেত। আমরা ঘনিষ্ঠ হতাম। উনি

আমার কপালে চুলে হাত বোলাতেন, আদর করতেন। আমি সে-আদর নিতাম। ওঁর সঙ্গে আমার মিলন ছিল সাদামাটা! উনি আমাকে বার কয়েক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। আমাদের কোনো সন্তানাদির সম্ভাবনাও দেখা দেয়নি।

আমাদের বিবাহিত জীবন এইভাবে কেটে যাচ্ছিল। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আমরা কেউ কাউকে ঘৃণা করিনি, কেউ কারুর ওপর ক্রুদ্ধ হইনি, বা মনে হয়নি আমাদের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ আছে।

আমি অভ্যস্ত, উনিও অভ্যস্ত—কাজেই আমাদের দাম্পত্য জীবন ও সম্পর্ক যে কোথাও চিড় ধরে যাচ্ছিল তা বলতে পারব না। ভালই তো ছিলাম আমরা।

'ইন্দু?'

'বলো। শীতের কথা বলছ?'

'না, এবার শীতে তোমাকে এক জায়গায় পাঠাব।'

'আমাকে কেন?'

'কলকাতার কাছেই। একটা ছোট বাড়ি বিক্রি আছে। ঘাটশিলায়।'

'বিক্রি! আমি কী করব?'

'যদি কিনে নিই—তাই ভাবছি। জায়গাটা ভাল। আমরা পুজোর সময়, শীতকালে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতে পারি। শরীর মন...'

'না না, আর বাড়ি কিনতে হবে না। পয়সা নষ্ট! আমাদের বাড়ি কেনা মানেই সেখানে লোক রাখো, মাঝে মাঝে গিয়ে খোঁজখবর করো। এই তো বেশ আছি।...যদি কখনও বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হয়, বাড়ি ভাড়া করে গেলেই চলবে।'

'তা ঠিকই বলেছ! আর আমরা এখানেই তো ভাল আছি।'

এইভাবে ভাল থাকার দিন মাস বছরগুলো পেরোতে লাগল। পাঁচ সাত আট দশ। আমরা পুরনো হলাম। পুরনো আসবাব, পুরনো ঘর বারান্দা, পুরনো রীতিনীতি যেমন নিজের জীবনের সঙ্গে মিশে যায়,

জড়িয়ে যায়—সেইভাবে আমাদের সম্পর্ক ও জীবন জড়িয়ে গিয়েছিল। আমি তো মানুষ, উনিও। কবে কোন গরমের দিন ছাদে উঠে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তারার মেলা দেখতে দেখতে নিশ্বাস ফেলেছি দীর্ঘ করে, কবে বর্ষার মেঘগুলো যখন আমাদের বাড়ির পেছন দিককার সাবুগাছগুলোর মাথায় নেমে আসার মতন হলে বুক ভেঙে নিঃশ্বাস পড়েছে—এ-সব কথা, কিংবা শরতের রোদ আলোয় আমার ঘরের আয়নায় নিজেকে কেমন মলিন মনে হয়েছে—তা নিয়ে কেই বা মাথা ঘামাতে গিয়েছে! আমি নই, উনিও নন। আমার তবু সময় ছিল মাথা ঘামাবার, ওঁর তো তাও ছিল না। সপ্তাহের রবিবার দিনটাও পুরোপুরি নিজের ছিল না। হয় সকালে কেউ এল, দু একজন, বিকেলেও এসে পড়ল কেউ না কেউ। ওঁর বন্ধুবান্ধব বলতে গণেশবাবু আর সেই দূর সম্পর্কের এক ভাই। গণেশবাবু ছুটির দিন বাড়িতে আসত না নেহাত দরকার না পড়লে। দূর সম্পর্কের ভাই দু-চার মাস অন্তর দেখা দিত, আসত সকালে, দুপুর কাটিয়ে বিকেল ফুরিয়ে বাড়ি ফিরত। সেই ভাইও পরে আর আসতে পারত না। ইছাপুর থেকে আসতে যেতে তার কষ্ট হত বোধ হয়। যারা আসত—বেশির ভাগই কাজের লোক, কোনো না কোনো কাজ নিয়ে আসত, ব্যবসাপত্রের টোপ ফেলে যেত, শেয়ারবাজারের কথাও তাঁদের মুখে শুনেছি।

আমার কাছেও আসত নন্দিতাদি, হেনা, কণিকাদি ; ওরা কখনো একা আসত কখনো জোড়ে আসত। গল্পগুজব হত। আমার স্বামীও থাকতেন ; তবে তাঁর ভূমিকাটা বেশির ভাগ সময় ছিল শ্রোতার। ও নিয়ে কেউ কিছু মনে করত না। এক একজন মানুষ থাকে যাদের স্বভাবই হল মুখ বুজে থাকা। আমাদেয় পারিবারিক অতিথিদের কাছে উনি সেই রকমই মুখ-বোজা মানুষ ছিলেন। ওঁর ব্যবহারের ধরনটাই ছিল—শিষ্ট, শান্ত, অত্যন্ত ভব্য! কেউ কিছু মনে করত না। বরং প্রশংসা করত।

হেনা একদিন আমার আর ওঁর সামনেই ঠাট্টা করে বলে বসল,

ধরিত্রীবাবু, আজকালকার শহুরে মেয়েরা শিব পুজোটুজো করে না। ভালই করে। করলে আপনার মতন মহাদেব জুটত। জুটলে মরত। আপনি দেখি সব ব্যাপারেই মিটিমিটি হাসেন। হুঁ-হ্যাঁ করেন। না জানেন ঝগড়া, না জানেন গলা তুলতে। রাগারাগি, ঝগড়া, হুড়ুম-দাড়াম ছাড়া কর্তা-গিন্নির চলে! সব পানসে হয়ে যায়! আমার কর্তার সঙ্গে আমার মাসে ছাব্বিশ দিন তুলকালাম হয়। অথচ, আমরা যা মজায় থাকি! ·· না বাপু, আপনি হিমালয়ের শিবকেও হার মানালেন। সে না হয় গাঁজা খেত, আপনি কী খান!'

আমার স্বামী একটু হেসে বললেন, 'ইন্দুসুধা পান করি।'

হেনা হেসে গড়িয়ে পড়ল। আমি লজ্জা পেলাম। আমার স্বামীর রসজ্ঞান যে রয়েছে সেই একদিন কি দু দিন বুঝেছি।

তা উনি মহাদেব ছিলেন কি না জানি না আমাদের বার বছর—এক যুগের বিবাহিত জীবন এইভাবে কেটে যাবার পর উনি একদিন হঠাৎ চলে গেলেন।

আমার জীবনের আর-এক পর্ব পর্ব শেষ হল।

পাঁচ

পরের পর্ব শুরু হল স্বামীর মৃত্যুর দিন থেকে।

রাজাকে আমি চিনতাম না। তাকে আমি প্রথম দেখেছি আমার স্বামীর অসুখের দিন থেকে।

আমার চোখের সামনে সেই দিনটি একেবারেই স্পষ্ট। গরমের দিন। কলকাতা শহর খাঁ খাঁ করে পুড়ছে। কাগজে বলছিল গত ন' বছরের মধ্যে এমন গরম আর পড়েনি। আরও গরম বাড়তে পারে, একটা তপ্ত আবহাওয়ার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে এ পাশে।

সকালে দুপুরে স্নান করে করেও আমার গা জুড়োচ্ছিল না। গরম যেন শরীরের সব জল শুষে নিচ্ছিল। বিকেলে আবার স্নান সেরে কাপড় বদলেছি সবে! রোদ তখনও ফুরিয়ে যায়নি, আলোও ম্লান হয়ে আসেনি তেমন, হঠাৎ নিচে থেকে ডাকাডাকি কানে এল।

নিচে নেমে দেখি আমার স্বামী। একটি ছেলে তাঁর হাত ধরে সিঁড়িতে তুলে দিচ্ছে। শৈলেন সামনে দাঁড়িয়ে। মুকুন্দ এগিয়ে গিয়ে বাবুর অন্য হাতটা ধরছে।

বললাম, ,কী হয়েছে ?'

স্বামী মাথা নেড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। ছেলেটি তাঁকে কথা বলতে না দিয়ে বলল, 'উনি পড়ে গিয়েছিলেন মাথা ঘুরে। গায়ে জ্বর।'

স্বামীকে দোতলায় এনে শোওয়ানো হল। উনি বিশেষ গা করতে চাইছিলেন না। কাপড় চোপড় বদলে বিছানায় শুয়ে নিজেই একটা ওষুধ খেলেন। ঘরে ওষুধের অভাব নেই। এটা ওটা লেগেই থাকে।

উনি শুয়ে পড়লে আমি দোতলার ঢাকা বারান্দায় এলাম। ডাক্তার-বাবুকে ফোন করব।

ছেলেটি বারান্দায় চেয়ার টেনে বসেছিল।

বাড়িতে ডাক্তারবাবু নেই। কিসের মিটিংয়ে গিয়েছেন। সেখান থেকে এলগিন রোডের চেম্বারে যাবেন।

ছেলেটি বলল, 'আমার জানা ডাক্তার আছেন একজন। ভাল ডাক্তার। তাঁকে আসতে বলব।'

আমি দোনামোনা করছিলাম। বাড়ির ডাক্তার বাদ দিয়ে নতুন ডাক্তার আনা। সেটা কি উচিত হবে ?

ছেলেটি আমার স্বামীকে কোথায় কীভাবে দেখেছে তার বর্ণনা দিল। বলল, রেড রোডের একটা পাশ ধরে উনি টলতে টলতে আসছিলেন। পড়েও যান মাঠে। আবার যখন উঠে দাঁড়াচ্ছেন, ছেলেটি ওঁকে দেখতে পায়। সে অন্য একটা ট্যাক্সিতে ফিরছিল। স্বামীকে হাত ধরে টেনে

এনে ট্যাক্সিতে তুলে নেয় নিজের। তারপর বাড়ি।

স্বামীর মুখে আগেই আমি শুনেছি, উনি একটা ট্যাক্সি করেই ফিরছিলেন ওঁর অফিস থেকে। গায়ে জ্বর নিয়েই। অন্যদিন আরও খানিকটা পরে ফেরেন। আজ আগেই ফিরছিলেন। জ্বরের দরুন। রাস্তায় ট্যাক্সি খারাপ হয়ে যায়। ট্যাক্সি কতক্ষণে সারানো যাবে বুঝতে না পেরে ট্যাক্সিঅলাই অন্য কিছু ধরে নিতে বলে নিজের গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জ্বরের ঘোরে উনি হেঁটে আসছিলেন। রেড রোডে ওই অফিস ছুটির সময় কোথায় আর অন্য ট্যাক্সি পাবেন। মিনিবাস-গুলোও ভিড়-ঠাসা। হাঁটতে পারেননি বেশি দূর। মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর এই ছেলেটি তাঁকে তুলে নেয়।

স্বামীর হাতে যে অ্যাটাচি কেস ছিল তাতে দরকারি কাগজপত্র ছাড়াও হাজার তিনেক নগদ টাকা ছিল। তেমন তেমন কিছু হলে আর টাকা সবই খোওয়া যেত।

বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে স্বামী বললেন, 'ছেলেটি বড় ভাল। আমার বড় উপকার করল। ওকে চা সরবত কিছু খাইয়ে ছেড়ো। শুধু যেতে দিও না।'

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আমি দ্বিধার গলায় বললাম, 'বাড়ির ডাক্তার হলেই ভাল ছিল। অন্য ডাক্তার ডাকা কি ভাল হবে।'

ছেলেটি বলল, 'আপনি কি ওঁর টেম্পারেচার দেখেছেন? উনি বেশ কাঁপছিলেন!'

বললাম, 'ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়ে টেম্পারেচার দেখতাম।'

'আগে দেখুন। আমি বসে আছি। আমার নাম রাজা।'

'রাজা!'

'রাজেন মুখার্জি। আমি আধ মাইলটাক দূরে থাকি। বলতে পারেন, পাড়ার ছেলে।...আপনি আগে টেম্পারেচার দেখুন।'

স্বামীর টেম্পারেচার নিতে এসে আমার ভয়-উদ্বেগ হয়নি। থার্মোমিটার টেনে নিয়ে যখন জ্বর দেখছি, একটু ভয় হল। দেখতে

দেখতে কি একশো তিন হয়ে গেল! আশ্চর্য! স্বামী তখন জ্বরের ঘোরে চোখ বুজেছেন।

বাইরে এসে রাজাকে জ্বরের কথা বলতেই সে উঠে গিয়ে ফোন তুলে নিল। ডাকল কাউকে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে এক ডাক্তার এলেন, দেখলেন স্বামীকে।

ডাক্তারবাবুর মনে হল, হিট্ ফিভার! ওষুধপত্র লিখে দিলেন। যাবার সময় বললেন, সন্ধের পর একটা খবর দিতে। জ্বর যদি বাড়তেই থাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। উনি আবার আসবেন।

আমার স্বামীর কী হয়েছিল আগেই বলেছি। পুরো বাহাত্তর ঘণ্টাও কাটল না; উনি চলে গেলেন। এমন আচমকা, অদ্ভুতভাবে মানুষ যায়—আমি জানি। কিন্তু সবাই তো যায় না। বেশির ভাগই নয়। একটু বুঝতে দেয়, সময় দেয়, মন বাঁধতে দেয়। উনি কিছুই দিলেন না। এমন কি ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই উনি অচেতন। কথাও বলতে পারেননি।

রাজা সেই যে আমার বাড়িতে এসেছিল, তারপর সে যেন ছায়ার মতন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকল। হাসপাতালে ছোটাছুটি করল। ওষুধপত্র জোগাড় করতে হাসপাতাল আর ওষুধের দোকান করল। বসে থাকল রাত জেগে হাসপাতালে। আমার পাশে।

শেষে শ্মশান।

শ্মশানে ওরা এসেছিল। গণেশবাবু, শৈলেন, কারখানার কয়েকজন, অফিসের রজনী, নান্টু, গিরিশ। আর এসেছিলেন, বিজনবাবু, সুধীনবাবু, দত্তরায়। অন্য যারা ছিল তাদের আমি ভাল চিনি না।

রাজা আমার সঙ্গেই ছিল।

আমিই আমার স্বামীর মুখাগ্নি করি।

শ্মশান থেকে বাড়ি ফেরার পর দু পাঁচজন ছিল। বাকিরা চলে গেল।

সন্ধে হল, রাত হল। আমি আর ঘরে যেতে পারছিলাম না।

দোতলায় ঢাকা বারান্দায় বসেছিলাম। এমন ফাঁকা লাগছিল যেন আমি একা কোথাও দাঁড়িয়ে আছি, আশেপাশে কেউ কোথাও নেই, এমনকি গাছপালা পাথর কিছুই চোখে পড়ছে না, ধুধু ধুধু ফাঁকা স্তব্ধ নির্জন কোনো তেপান্তর আমার চারপাশে।

'ইন্দুদি?'

বার তিনেক ডাকল রাজা, তারপর আমার কাছে এসে মাটিতেই বসে পড়ল। 'ইন্দুদি, তুমি একটু কিছু মুখে দাও। একটু দুধ অন্তত। তারপর ঘুমের ওষুধ খেয়ে শোবার চেষ্টা করো। ঘুম তোমার হবে না। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ বসে থাকবে। তুমি বসার ঘরেই শুয়ে থাকার চেষ্টা করো। আমি আছি।'

রাজা বোধহয় সেই প্রথম আমায় 'ইন্দুদি' বলল, তুমি টুমি করে কথা বলল আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর কখন যে কেঁদে উঠেছি নিজেই জানি না।

রাজা আমার হাঁটু ছুঁলো। তারপর নিজের কপালমাথা আমার হাঁটুর ওপর রেখে মুখ নিচু করে বসে থাকল।

ওঁর চলে যাবার প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে সামলাতে শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। তারপর দু-একটা আচার। শেষে যেন আমি খানিকটা মন বাঁধলুম।

আমার স্বামী মারা যাবার মাত্র তিনদিন আগে যে ছেলেটি একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে, কোনো ভূমিকা নেই, সাড়া নেই আমার কাছে এসে পড়ল সে আর আমায় ছেড়ে চলে গেল না।

ওই যে নন্দিতাদি, কণিকাদি, হেনা, মিসেস দত্তরায়, সেনগিন্নির দল যে বিজনবাবু, সাধনবাবু,—এরা আমার কাছে প্রথমটায় এসেছে সান্ত্বনা দিতে। এসেছে অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ রাখতে বা সামজিকতা রাখতে—কিন্তু কে আমার সঙ্গী হতে এসেছে, কে এসেছে, কে এসেছে সাহচর্য দিতে? কেউ নয়। নন্দিতাদি তবু ঘন ঘন আসতে, ফোন করত, কাজের দিন কোমর বেঁধে খেটেছে। অন্যরা নিয়মরক্ষা করে গেছে,

মানুষ যা করে।

একমাত্র রাজাই আমার সকাল দিন দুপুর সন্ধের সঙ্গী হয়ে থাকল। সে খাটাখাটুনি করল মুখ বুজে। তার মধ্যে না কোনো আড়ষ্টতা, না দূরত্ব। সে যেন আমার—আমাদের পরিবারের কত কালের লোক।

দিন তো নদীর জলের মতন বয়ে যাচ্ছিল।

গ্রীষ্ম ফুরালো। বর্ষা এসে পড়ল ঝমঝমিয়ে। রাজা এক একদিন সাত সকালে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এ বাড়ি এসে হাজির হত, কোনোদিন বা হু হু বাদলা আষাঢ়ে বাতাস নিয়ে বিকেলে এসে বাড়ি ঢুকল। আবার আকাশ যখন মেঘে মেঘে কালো, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সাবুগাছের পাতা দুলছে—ঘনঘটার ঘোর নিয়ে ছুটতে ছুটতে এল রাজা। 'ইন্দুদি, আজ একটা তোলপাড় হবে। আকাশ দেখেছ? টানা তিন দিনের স্টক্ নিয়ে মেঘগুলো এসেছে।'

রাজা যখনই আসত সকাল দুপুর বিকেল সন্ধে—আমি যেমনই থাকি বেরিয়ে এসেছি, ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি হাসি মুখে। আমার চোখমুখ দেখে ও বুঝেছে—ওর আসার জন্যেই যেন আমি হাঁ করে বসে ছিলাম।

'চোখ লাল কেন?'

'বাইরে কী রকম ধুলো উড়ছে। চোখে ঢুকে গেল।'

রাজার মাথার চুল এলোমেলো, ধুলোয় কিরকির করছে, গালে মুখে হাত ছোঁয়ানো যায় না—এত ময়লা উড়ে মুখে লেগেছে। 'যাও, আগে পরিষ্কার হয়ে এসো।'

'আরে, চোখটা আগে দেখে দাও।'

রাজার চোখ দেখি, আঁচলের কোনা পাকিয়ে ধুলোবালি পরিষ্কার করে দি। ও বাথরুম থেকে স্নান সেরে ফিরে আসে, প্যান্ট জামা বদলে নেয়, (এ বাড়িতে এখন ওর পাজামা পাঞ্জাবি প্যান্ট পার্ট চটিজুতো পড়ে থাকে বাড়তি হিসেবে) তারপর চুল আঁচড়াতে বলে, 'নাও, চিরুনিটা চালিয়ে দাও—কিচকিচ করছে ধুলো' বলে আমার গায়ের পাশে মাটিতে

বসে পড়ে।

এরপর বৃষ্টিও নামে তুমুল।

দেখতে দেখতে বর্ষার পালা শেষ হয়ে আসতে চলল। আমি ততদিনে নিজেকে সামলে নিয়েছি অনেকটা। স্বামীর কারখানা আর অফিসের পুরো দায় এখন গণেশবাবুর। বাড়ির মধ্যে থেকে কনক কেমিকোর ছোট অফিস আর গুদোম আমি সরিয়ে দিয়েছি। ভাল লাগত না আমার। যে মানুষটির দরকার পড়েছিল ওই অফিসে, তিনি যখন নেই—আমার কী দরকার বাড়ির মধ্যে অফিস বসিয়ে রেখে। ওটা থাকলেই বরং খারাপ লাগত। চোখের আড়ালে থাক—আমার কিছু আসে যায় না।

গণেশবাবু দু একবার আমার কাছে ব্যবসাপত্রের কথা বলতে এসেছে। বার দুই কম্পানির উকিল-টুকিলও নিয়ে আসতে ভোলেননি। আমি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি, কারখানা অফিসের কিছুই আমি জানি না, বুঝি না, যা করার গণেশবাবুই করবে। দু'পাঁচটা কাগজপত্রেও আমাকে সই করে দিতে হয়েছে উকিলবাবুর সামনে।

অফিস কারখানার কথা আমি আর বিন্দুমাত্র ভাবি না। গণেশবাবু মাসান্তে নিজে এসে একটা থোক টাকা দিয়ে যায়। বলে, বউদি, আপনার বাড়তি টাকার দরকার হলে একটু জানাবেন। ফোন করবেন একটা।

কী করব বাড়তি টাকা নিয়ে। দিন তো আমার ভালই চলে যাচ্ছে। তা ছাড়া স্বামীর আর আমার নামে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা পড়ে আছে, আমার নিজের নামেও টালিগঞ্জের বাড়ি বিক্রির গচ্ছিত টাকা রয়েছে। আর আমার টাকার কী দরকার।

বাড়িতে যারা কাজকর্ম করত তাদের আমি ছাড়িনি। ওরা যেমন ছিল তেমনই আছে। উনি থাকার সময় মুকুন্দকে খানিকটা ব্যস্ত থাকতে হত বাবুর জন্যে, এখন ওর কাজ কমে গিয়েছে, শুনেছি ওর ভাগ্নেকে দেশ থেকে আনিয়ে এই পাড়ারই কোথায় পানের দোকান

দিয়েছে সাজিয়ে গুছিয়ে। ভালই তো।

বর্ষা যখন শেষ হয়ে আসছে তখন একদিন নন্দিতাদি বেড়াতে এসে একটা কথা তুলল। আমি কচি খুকি নই, কে কী দেখছে, কে কী ভাবছে, আমি কি বুঝতে পারি না। বেশ পারি। গ্রাহ্য করি না, বা সেদিকে তাকাই না।

নন্দিতাদি বলল, 'তোর কি শরীর খারাপ যাচ্ছে?'

'না, অসুখ বিসুখ নয়, কেমন একটা…'

'ডাক্তার কী বলছে?'

'দেখাইনি।'

'কেন?'

'কী হবে দেখিয়ে। দেখালেই বলবে, একটু অ্যানিমিয়া রয়েছে, প্রেসার সামান্য লো, ঘুম ঠিক মতন হচ্ছে না; হজমের গোলমাল… তারপর বাঁধা কতকগুলো ওষুধ লিখে ফর্দটা এগিয়ে দেবে।'

'তুই ডাক্তার?'

'ডাক্তারে আমার ভক্তি নেই।…তখন একেবারে বিছানায় পড়ব তখন দেখা যাবে।' বলে আমি হাসলাম।

নন্দিতাদি বলল, 'ভাবনা নেই, পড়বি এবার।'

আমি হেসে বললাম, 'পড়ব না। বর্ষাটা আমার সইল না। পুজোর সময় বাইরে কোথাও বেড়াতে যাব ভাবছি।'

'কোথায়?'

'দেখি! রাজার কী মতলব।'

নন্দিতাদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল বেশ কয়েক পলক। তারপর নিজের ব্যাগ থেকে পান জরদার কৌটো বার করল। নন্দিতাদির পানের নেশা। 'খাবি?'

'না।…আচ্ছা দাও খাই একটা।'

আমায় পান দিল নন্দিতাদি। নিজে পান জরদা মুখে দিল।

কিছুক্ষণ পরে বলল, 'রাজার মতলব মানে, তুই কিছু জানিস না?'

'না। ও বলছিল, শিমুলতলা, গিরিডি কিংবা পরেশনাথ হাজারি-বাগ...'

'ও!...তা রাজা কী করে রে?

'ওদের ব্যবসা আছে, মস্ত বড় দোকান...গানবাজনার ব্যাপার—রেডিয়ো রেকর্ড টিভি টেপ রেকর্ডার...তার সঙ্গে ফ্রিজ ট্রিজও বিক্রি হয়, ফ্রিজ গিজার...ইলেকট্রিকের...'

'ও! বড়লোক।'

'রাজা বলে, ও ভীষণ গরিব, বলে আমি হাসলাম। দোকানটা জেঠা-কাকারা দেখে। ওর বাবা নেই। মা আছে। দোকানে ও খুশিমতন যায়, যতক্ষণ খুশি থাকে। বাবা নেই বলে জেঠা-কাকার আদরে আদরে উচ্ছন্নে গিয়েছে।'

নন্দিতাদি আমার চোখমুখ দেখতে দেখতে তার হাতের রুমালের কোনা দিয়ে দাগ মুছলো পানের ঠোঁট থেকে। 'ও তো এই পাড়ার কাছাকাছি থাকে না?'

হ্যাঁ। ওদের বাড়ি ভবানীপুরের গায়ে গায়ে।'

'তুই গিয়েছিস কখনো?

'আমি। না, কেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।...রাজাই এখন তোকে দেখাশোনা করছে।'

আমি নন্দিতাদির চোখের দিকে তাকালাম। বুঝতে অসুবিধে হল না—কী বলতে চায়। জবাব দিলাম না। কথাটা কানে ভাল লাগেনি।

যাবার সময় নন্দিতাদি বলল, 'তোকে একটা কথা বলি, কিছু মনে করিস না। সেই—ধরিত্রীবাবু যাবার দিন থেকে ওই ছেলেটা এ বাড়িতে এসে পড়ে আছে। আমি বুঝতে পারি না...'

নন্দিতাদিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি রুক্ষভাবে বললাম, 'তোমায় বুঝতে হবে না।'

দাঁড়িয়ে পড়ল নন্দিতাদি। শেষে বলল, 'না, তোর ব্যাপার তুই বুঝবি। তবে—আমাদের চোখে লাগে।'

ওদের যে চোখে লাগছিল তা আমি বুঝতে পারতাম। একই কথা, একই রকম চোখ করে, কখনও ইঙ্গিতে, কখনও ঠেস দিয়ে, ঘুরিয়ে অন্যরাও বলত। কথার হেরফের থাকত বইকি, তবে মূল কথাটা তো একই।

আমার সম্পর্কে যে একটা অন্যরকম ধারণা নন্দিতাদি এবং আমার পরিচিত জনের মধ্যে হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে তা আমি অনুভব করতে পারতাম। বাড়ির কাজকর্মের লোকগুলোও আমাকে দেখত, কিছু বলত না।

আমি স্বীকার করব, আমার স্বামী মারা যাবার দিন থেকেই রাজা আমার বাড়িতে পা রাখতে পেরেছে। সেদিন যখন সকলেই চলে গেল, বাড়ি শোকাচ্ছন্ন, নিঝুম, থমথম করছে, চারদিকে এক অদ্ভুত শূন্যতা, সেদিন আমি যখন দোতলার বারান্দায় সোফায় বসে নিজের চোখমুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদছিলাম সেদিন ওই রাজাই আমার সোফার পাশে মাটিতে পায়ের কাছে বসে তার মুখখানা আমার হাঁটুর ওপর রেখে চুপ করে বসেছিল। আমি কেমন করে বোঝাব, ওর এই সহানুভূতি দুঃখ অন্তরঙ্গতা আমাকে কিসের স্পর্শ দিচ্ছিল।

আমার যারা বন্ধু, পরিচিত আমার স্বামীর যারা পরিচিত—তারা তখন কোথায়? শ্মশানে মুখ দেখিয়ে যে যার নিজের বাড়ি ফিরে গিয়েছে। বার কয়েক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার পর স্নানটান সেরে গায়ে পাউডার মেখে বাড়িতে বসে বসে চা সরবত খেয়েছে। টেলিভিশন দেখছে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে বউ নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

ইন্দুলেখার যা গেল—তার নিজের গেল। ওরা শুধু সাক্ষী হয়ে রইল আমার আঘাতের। কেউ তো ইন্দুলেখার বুকের তলায় কান পেতে অনুভব করার চেষ্টা করল না—কোন্ শূন্যতা আর বেদনা আমাকে নিঃসাড় করে তুলছিল।

রাজা আমার কাছে সেদিন কীভাবে দেখা দিয়েছিল সে আমিই জানি।

সেই যে রাজা আমার কাছে এল—তখন থেকে ও আর আমাকে ছেড়ে গেল না। আমার বাড়িতে আমার ঘরে দোরে ওর জন্যে কোথাও কোনো বাধা থাকল না। ও হ্ল অবারিত। যখন খুশি আসে যতক্ষণ খুশি থাকে খায়দায় স্নান করে, গল্পগুজব করে, ঘুমোয়, হইচই করে, আবার চলে যায়।

এখন মাঝে মাঝে হয়েছে, বর্ষার সময় রাজা জলে ভিজে ঝোড়ো কাক হয়ে সন্ধের গোড়ায় এসেছে, তারপর আর রাত্রে বাড়ি ফিরে যেতে পারেনি। আমার শোবার ঘরের পাশের ঘরে ওর শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। ও নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে। সকালে উঠে ফাজলামি করে বলেছে, 'ইন্দুদি, আমার ভীষণ ভূতের ভয় তুমি আমাকে ভূতের হাতে ছেড়ে দিয়ে দিব্যি ঘুমোলে। আমি সারা রাত রাম রাম জপেছি।'

আমি ওর গালে আদর করে চড় মেরে বলেছি, 'ভূত ভাল, পেত্নি ভাল নয়।'

'পেত্নি তাড়াবার মন্ত্র আমার জানা আছে।'

'কী সেটা ?'

'ব্যোম কালী, কালী, করালবদনী, নৃমুণ্ড মালিনী...'

আমরা দুজনেই হেসে উঠতাম। সে হাসি সহজে থামতে চাইত না। পায়ে পায়ে ও এগিয়ে আসছিল।

বাইরের অন্ধকার যেভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে, ঘর ছায়াছায়া কালো হয়ে ওঠে, তারপর অন্ধকারে ভরে যায় সব—তেমন ভাবেই কি রাজা আসছিল ?

না, তেমন ভাবে নয়।

শেষ রাতের অন্ধকার, ধূসরতা আবছা সরিয়ে যেভাবে ভোরের ফরসা দেখা দেয়, আলো আসে, রোদ ফুটে ওঠে—সেইভাবে রাজা আমার জীবনে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল। ও এল আমার আনন্দ হয়ে

চারপাশের মলিনতা কাটিয়ে রাজা যেন এসে বলল, 'ইন্দুদি, আমি এসেছি। জানলা দরজা খুলে দাও। দেখো কত রোদ উঠেছে।'

আমি যেন নিজের কাছেই অপ্রস্তুত। দেখেছো, আমার ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করে আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুধু দুঃস্বপ্ন দেখেছি, চোখের পাতা খুললেই মনে হয়েছে এখনও অন্ধকার ঘোচেনি। কিন্তু কোথায় অন্ধকার!

জানলা দরজা খুলে দিলাম। দেখি, আলো রোদ, সকালের বাতাস। বর্ষার মেঘ নেই। শরৎ ফুটে উঠেছে আকাশে।

এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার চোখ সকালটি দেখতে লাগল।

'ইন্দুদি?'

রাজা ডাকছিল। কোথায় সে?

'আসছি। দাঁড়াও।' আমি দরজা খুলে রাজাকে খুঁজতে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

ছয়

একদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছি. বাসী মুখ বাসী চোখ, বাড়ির পেছন দিককার সাবুগাছের পাতায় শরতের ভোরের রোদ পড়ে আলোর চিকরি উঠেছে, বারো মেসে শিউলিতলায় শিউলি ছড়িয়ে আছে, একটা চন্দনা কোত্থেকে এসে গাছের পাতা কাঁপিয়ে উড়ে গেল, হঠাৎ শুনি রাজা এসে বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছে।

এত সকালে রাজা? ওর অবশ্য সকাল বিকেল সন্ধে নেই!

শোবার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই রাজা বলল, 'এই ঘুম থেকে উঠলে! শিগগির তৈরি হও।'

আমি কিছু বুঝলাম না। কেন তৈরি হব। কোথায় নিয়ে যাবে ও? আগে তো কিছুই বলেনি। অবাক হয়ে বললাম 'মানে? কিসের তৈরি?'

'তোমায় এক জায়গায় নিয়ে যাব।'

'কোথায়?'

'চলো, দেখতে পাবে।'

'কোথায় যেতে হবে বলবে তো! সাত সকালে উঠে এভাবে ছোটা যায় নাকি? কাল তো কিছুই বললে না।'

'বলাবলির কী আছে। ভুম করে মনে হল, চলে এলাম। ইন্দুদি, আমি একটা গাড়ি এনেছি।…এখান থেকে বেরিয়ে সোজা ব্যারাকপুরের দিকে যাব। ব্যারাকপুর ছাড়িয়ে। আজ আকাশটা দেখছ! পাগলা করে দিচ্ছে। নাও, রেডি হও।'

পাগলের কথা! এভাবে তিন মিনিটের নোটিশে বেরুনো যায়? আমার যে স্নানটুকুও হবে না। বললাম, 'এভাবে যাওয়া যায়! এখনও চোখমুখে জল পর্যন্ত দিইনি। বাসী হয়ে বেরিয়ে পড়ব! মাথাটাথা খারাপ হয়েছে তোমার?'

রাজা তারপর যা করল, কী বলব! লাফ মেরে এসে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল, দুহাতে, তুলে নিয়ে বাথরুমের দিকে এগুতে এগুতে বলল, 'জলে তোমায় চুবিয়ে দিচ্ছি, বাসী কেটে যাবে।'

আমি লজ্জায় মরি। হাত পা ছুঁড়ে ওর জাপটানি থেকে নেমে পড়ি।

রাজার স্বভাবটাই ছিল ওই রকম। কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ বলল, 'চলো ইন্দুদি অ্যাকাডেমিতে একটা নাটক হচ্ছে। বিভাসের। দেখে আসি।' কিংবা সন্ধের পর খেয়াল হল, বলল, 'সিনেমায় চলো। দারুণ ছবি হচ্ছে গ্লোবে।' কোনোদিন বা একেবারে টিকিট সমেত হাজির। 'ইন্দুদি, আজ হিন্দি লাগাব! আমার হট্ ফেবারিট রেখা আছে।…তোমাকে রেখার নাচ দেখাব।'

ওর যাবার কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না। খেয়াল হল তো আমায় টেনেটুনে নিয়ে চলল গঙ্গার ঘাট, শিবপুর, কখনো নেহাতই চৌরঙ্গি পাড়ায়, কখনো এ বাজার ও বাজার।

একগাদা রেকর্ড আর টেপ এনে রেখেছিল ইংরিজি গানের। সেগুলো লাগিয়ে দিয়ে কী মাথা দোলাবার ঘটা। আমার কান ঝালা-পালা হতে যেত। বলতাম, 'উঃ পাগল হয়ে যাব।' রাজা হাসত, 'তুমি কিস্যু বোঝ না। এরা এখন টপ্ সিঙ্গার।'

ছেলেমানুষির চূড়ান্ত।

শুধু ছেলেমানুষি হুই হল্লা কেন, রাগও ছিল অভিমানও ছিল। ও যখন নিজের কথা বলত, আমি কান পেতে শুনতাম, কথাগুলো যেন গিলতাম হাঁ করে।

রাজা বলত ওরা এক মস্ত পরিবারের ছেলে। তেতলা বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর ভরতি। জেঠা, কাকা, জেঠিমা, কাকিমা, জনা এগারো ভাইবোন, কেউ বড় কেউ ছোট। বাড়ি যেন গমগম করে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। দুটো ঠাকুর মিলে রান্না করে, দুই গিন্নি মিলে ভাঁড়ার সামলায়। বাড়িতে আজ সত্যনারায়ণ, কাল জগদ্ধাত্রী, পরশু নীল ষষ্ঠি …পর পর লেগে আছে। জেঠা মশাই রামকৃষ্ণ, মেজকাকা সাঁইবাবা, ছোটকাকা আবার পলিটিকসের রেসকোর্সে নেমে পড়েছে। ছোটখাট নেতা হয়ে পড়েছে এর মধ্যেই। মাঝে মাঝে মিছিল নিয়ে এসপ্লানেড ইস্টে যায়, পুলিসের লাঠি খায়। আবার কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হবার জন্যে ফিল্ড তৈরি করে ফেলেছে।

ইন্দুদি, আমি অরফ্যান, মানে ঠিক অনাথ নয়, পিতৃহীন—বলে হাসতে হাসতে রাজা বলে, আমি যখন মায়ের পেটে, আমার বাবা—এক শালা শুয়োরের বাচ্চা বাস ড্রাইভারের গাড়ির ধাক্কা খেয়ে মারা গেল। বাবা আমাদের ব্যবসার অর্ধেকটা সামলাতে পারত। দারুণ পরিশ্রমী আর কাজের লোক ছিল বাবা। চলে যাওয়ায় জেঠামশাই একেবারে ভেঙে পড়ল। কাকাকে টানতে হল ব্যবসায়। বড় কাকার

ইচ্ছে ছিল পাইলট হবে নাহয় গ্লাসগো যাবে ইনজিনিয়ারিং পড়তে। ও সব আর হল না। আমাদের রাবণের গুষ্টি, ব্যবসাটাও ফেলনা নয়। কাকাদেরও লেগে পড়তে হল। ছোট কাকা অবশ্য একটা ল' ডিগ্রি নিয়ে রেখেছে। আমার জেঠতুতো দাদা দোকানে বসে মেজদা কেটে পড়েছে নেভিতে, বাচ্চু আর্টিস্ট, ফেলু এবার এম এ দিচ্ছে। আমাদের বড়দি দিল্লিতে, মেজদি কলকাতায়, ঝুনু গিয়েছে শিলিগুড়ি। .. আর আমার কথা যদি বলো, আমি অ্যাজ ইউ লাইক্ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাপ-মরা ছেলে, বাড়িতে আমার ফ্রি জোন স্ট্যাটাস। কারুর কিচ্ছুটি বলার নেই। জেঠা কাকা জেঠি কাকি সবাই 'রাজ' বলতে অজ্ঞান। আর আমার মা কী করে জান? শুনলে অবাক হয়ে যাবে। মা সংস্কৃত শিখেছে যত্ন করে, ইয়া ইয়া বই অনুবাদ করে।

'তুমিই কিছু করো না?'

'কেন! দোকানে যাই।'

'সে তো বেড়াতে।'

'কী বলছ ইন্দুদি। আমি যদি দু ঘণ্টা দোকানে থাকি, বোলচাল মেরে চার পাঁচ হাজার টাকার বিজনেস করব। দারুণ সেলসম্যান আমি।'

'নাকি?'

'সেলস্ ম্যানের যে যে গুণ থাকার দরকার আমার আছে। স্মার্ট, কথাবার্তায় মিছরি, গলা কাটায় পয়লা নম্বর।'

আমি হেসে ফেলি গলা ছেড়ে।

রাজাকে দেখতে সত্যিই ঝরঝরে তরতরে। বেশ চেহারাটি, চোখ দুটি যেন হাসিখুশি ভরা। গলার স্বর কী ভরাট নরম।

এই ছেলেরেই আবার রাগ কত! বাইরে কোথায় কী করছে, কার ওপর রেগে গিয়ে কী বলেছে ঝগড়া করেছে কার সঙ্গে, হাতাহাতি করেছে কোথায় সেসব বর্ণনা মাঝে মাঝে মাঝে আমায় শুনিয়ে প্রমাণ করত চায় সে নাকি রাগলে অন্ধ। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

ওর রাগ আমি দেখেছি। রেগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য না হোক, মুখখানা টকটকে হয়ে ওঠে, ঠোঁট যেন ফুলে যায়, গলার স্বর থমথমে। কখনো কখনো হাতপা ছুঁড়ে চেঁচাতে থাকে।

একদিন আমি কী কুক্ষণে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলাম, 'এই, যখন তখন আমার পায়ের কাছে বসে সুড়সুড়ি দেবে না তো!'

'কেন!'

'কেন আবার কী! দেবে না।'

'তোমার পা কি সোনার পা?'

'সোনার পায়ে সুড়সুড়ি লাগে না!'

'তোমার পায়ে তাহলে কী দিতে হবে! ফুল!'

'কিচ্ছু দিতে হবে না।...যে বদ অভ্যেস করেছ, হুট করে পায়ের কাছে বসে পায়ের পাতায় গোড়ালিতে সুড়সুড়ি দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে রাজার মুখের চেহারা পালটে গেল। টকটকে হয়ে গেল মুখ। চোখ রুক্ষ, ঠোঁট কাঁপতে শুরু করল। দাঁড়িয়ে পড়ল লাফ মেরে। বলল, 'তোমার পা যে লজ্জাবতী লতার মতন জানতাম না। ঠিক আছে।' বলে আর দাঁড়াল না, রাগে ছিটকে উঠে চলে গেল।

আমি ভাবতেই পারিনি এমনটা হতে পারে। নিজেই কেমন অপ্রস্তুত। আফসোসে আমারই চোখ করকর করে ওঠে।

আর একদিন শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছিল দুপুর থেকে পিঠ কোমর টাটিয়ে রয়েছে। শুয়ে ছিলাম নিজের ঘরে।

রাজা এসে ডাকল, 'ইন্দুদি, টিভিতে একটা ছবি দেখবে। ভিডিও ক্যাসেট এনেছি। ইংলিশ ছবি'

'না।'

'হাসির ছবি।'

'আমার ভাল লাগছে না।'

'কী হয়েছে?'

'শরীর খারাপ। মাথা ধরেছে।'

তুমি ওঠো। বাইরে চলো। সোফায় বসে টিভি দেখবে। আমি তোমার মাথায় মলম ঘষে দেব।'

'না না, আমি চোখ খুলে তাকিয়ে থাকতে পারব না।'

'পারবে।···দেখো না একটু, হাসির চোটে তোমার মাথা ধরা ভো কাট্টা হয়ে যাবে।'

ও আমায় টানাটানি শুরু করল।

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কি হচ্ছে। শাড়িটা ছিঁড়বে নাকি?'

রাজা যেন পলকে কেমন থমকে গিয়েই ক্ষেপে গিয়ে চেঁচাতে লাগল। কী যে বলল, আর না বলল। 'আমি কি কুকুর যে তোমার শাড়ি দাঁতে ধরে টানছি!

মুহূর্তের মধ্যে যেন আমার ঘরে একটা ঝড় বইয়ে সে চলে গেল।

আমি আর কী বলব! বিছানায় শুয়ে কাঁদলাম।

এই রকমই ওর রাগ। মাথামুণ্ডু নেই।

রাজা যে মদ-টদ খেত তা নয়। আচমকা এক আধদিন একটু নেশা করে আসত, বুঝতে পারতুম।

'মদ খেয়েছ।'

'বিয়ার।'

'বিয়ার টিয়ার বুঝি না। নেশা করে আমার কাছে আসবে না।'

'কেন?'

'কেন আবার কী। আমি বলছি।'

'তুমি একেবারে আশ্রমের সন্ন্যাসিনী মায়ের মতন কথা বলছ যে।'

'কেন, আমি কি অন্য কিছু! কী ভাব তুমি আমায়?'

'ইন্দুদি, তোমার মুখ ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'আমায় তুমি ধমকাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, আমি তোমায় ধমকাচ্ছি! তুমি আমাকেই বা কী ভেবেছ? আমি তোমার কাছে দেবদাস হয়ে এসেছি?'

আমি রাগে কাঁপতে থাকি। ও কী যেন বলতে বলতে চলে যায়।

ঘর ছেড়ে। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ। চলে যাচ্ছে রাজা।

রাত্রে যদি বা না পড়ে সকালে আমার রাগ পড়ে যায়. নিজেরই অস্বস্তি হয়, ভাবি—ছেলেমানুষি আমিই করেছি। রাজার যা বয়েস, আর আজকালকার যা রেওয়াজ তাতে ও এক আধদিন একটু মদটদ যদি খায়ও আমার মাথা গরম করার কী আছে! ওর বয়েসের ছেলেরা আরও কত খারাপ নেশা করে, দিনকাল যা পড়েছে এখন। না, আমারই অন্যায় হয়েছে। অমনভাবে কথা বলা উচিত হয়নি।

ওদের বাড়িতে ফোন করে ওকে খুঁজে বার করা কঠিন। এ বলে, 'ধরুন', ও বলে 'ধরুন'। ধরুন ধরুন করে দশ মিনিট কেটে যায়, তারপর বিরক্ত হয়ে ফোন ফেলে দিই। তার চেয়ে দোকানই ভাল।

দোকানে ওকে ফোন করব বলব ভেবেও একটু দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে করে। নিজের নাম বলব না, গলার স্বর পাল্টাবার চেষ্টা করব, দেখি ও কী বলে।

দোকানে ফোন করে রাজাকে ধরি।

'আপনাদের দোকানে সেদিন আমার টিভি সারালাম। টাকাও নিলেন গলা কেটে। কেমন সব মেকানিক রাখেন?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'ছবি আসছে না।'

'কবে সারিয়ে নিয়ে গিয়েছেন?'

'এই তো।'

'ঠিক আছে। দেখছি।'

'কোথায় দেখবেন?'

'আমি খুঁজে নেব।'

শেষ বিকেলে রাজা এসে হাজির। বলল, 'দেখো, ইন্দু মডেল টিভির ডিফেক্ট আমি জানি', বলে আঙুল দিয়ে মাথা দেখাল।

আমি বললাম, 'তোমার না আমার কার কথা বলছ?'

'তোমার।'

দু পা এগিয়ে গিয়ে এক চড় মারলাম ওর পিঠে। 'ফাজলামি! ছোট বড় জ্ঞান নেই। যা মুখে আসে বলছে ...।'

তারপর দুজনেরই হাসাহাসি।

রাগের তবু চেহারা আছে বোঝা যায়, অভিমান যে বুঝতে পারি না চট করে। রাজার যে কখন কিসে অভিমান হত প্রথমে আমি ধরতেই পারতাম না। কোনো দিন হয়ত চুপচাপ আছি, কথা কম বলছি— ওর অভিমান হল, কখনো যদি ওর সঙ্গে সমান তাল মিলিয়ে বকবক কম করেছি—ওর মনে লাগল, একটা কিছু এনেছে—সে খাবারই হোক কিংবা ফুলফল—যদি বললাম, আবার আনলে...সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব পাল্টে গেল। এমন কি আমি যদি সাদা খোলের শাড়ি পরতাম, যদি মনখারাপ করে মুখ নিয়ে বসে থাকতাম, যদি একটু অন্যমনস্কভাবে কথা বলেছি রাজার সঙ্গে—দেখেছি ওর অভিমান হত। পান থেকে চুন খসলেই ওর অভিমান।

আমি বুঝতে পারতাম, বাপমরা ছেলে বাড়িতে দশজনের কাছে এত আদর পেয়েছে যে অভিমান করা ওর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও হয়ত বোঝে না। একদিন আমি বলেছিলাম অনেকের আছে না, আকাশে মেঘ জমলেই হাঁচতে শুরু করে, তোমারও তাই হয়েছে। চোখ তুলে ডাকলেই তোমার অভিমান।

একদিন ওর এমন অভিমান হল যে বাচ্চা ছেলের মতন কেঁদেই ফেলল।

রাজা আমার বাড়ি থেকে কাকে যেন ফোন করত লুকিয়ে লুকিয়ে। আমার কানে পড়ত না, কিন্তু চোখে পড়ত।

ও বারান্দায় বসে ফোন করছে, হঠাৎ আমি এসে পড়েছি, সঙ্গে সঙ্গে গলা নামিয়ে নিল, মুখের হাসি কমে গেল, পাশ কাটাতে লাগল ফোনে, তারপর রেখে দিল ফোন।

'কে?'

'বন্ধু!'

'কোথায় থাকে!'

'যাদবপুর'। বলে একেবারে অন্য কথা।

একদিন আমি সন্ধেবেলায় কাপড়চোপড় বদলে আমার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি। ঘরের বাতিটা হঠাৎ নিভে গিয়েছিল। বোধহয় বাল্বটা নষ্ট হয়ে গেল। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলতে যাচ্ছিলাম, দেখো তো বাল্‌বটা গেল বোধহয়, পালটে দাও—দেখি ও চেয়ারে গা এলিয়ে বসে ছাদের দিকে মুখ করে ফোনটা আঁকড়ে খুব হাসিঠাট্টা করছে। আমাকে দেখতে পায়নি, পায়ের শব্দও শোনেনি।

ওর যখন খেয়াল হল তখন আমার দু দশটা কথা শোনা হয়ে গেছে। আমায় দেখে খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে 'আচ্ছা!' ও কে। পরে কথা হবে…' করে ফোনটা রেখে দিল।

আমি বললাম, 'কে?'

'ও-ই একজন বন্ধু।'

'মেয়ে বন্ধু?'

'মেয়ে বন্ধু। ধ্যাত…। মেয়ে বন্ধু আবার কে?'

'তোমার ছেলে বন্ধুরা কি মেয়েদের নাম নিচ্ছে।'

'মেয়েদের নাম।'

'এই, আমি কি কালা। লিলি লিলি বলছিলে কাকে?'

'লি-লি।…ও লিল্লি। লিলি লিলি লিলি কিলি কিলি কিলি। এ তোমার মেয়ে লিলি নয়, দি গ্রেট ফাস্ট বোলার লিলি, ডেনিস লিলি। লিলি টম্‌সন। এ বারের ক্রিকেট কাগজটায় দারুণ একটা ইন্টারভিউ বেরিয়েছে লিলির! সেই কথাই বলছিলাম।

একদম পাশে গিয়ে আমি বললাম, 'ফোন নম্বরটা দাও তো—তোমার লিলি কিলিকে একটা ফোন করি।'

ও আমার দিকে থতমত চোখ করে তাকিয়ে থাকল। তারপর ঢোঁক গিলে বলল, 'তুমি আমায় মিথ্যেবাদী ভাবছ।'

'হ্যাঁ।'

'আমি তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলছি!

'বেশ তো ফোন নম্বরটা দাও না। দেখি মিথ্যে বলছ, না সত্যি।'

রাজা একেবারে চুপ। তারপর কেঁদে ফেলল। ছেলেমানুষও ধরা পড়ে অমন করে কাঁদে না।

ছোটখাট মিথ্যে কথা ও আরও বলত। সেসব ধর্তব্যের মধ্যে নয়। সকলেই বলে। আমিও বলি।

লিলির ব্যাপারে আমার কেমন গায়ে একটু লেগেছিল। রাজা আমার কাছে কথাটা লুকিয়ে রাখছ কেন? ও কী ভাবছে—আমি রাগ করব। কেন?

সাত

লিলিকে নিয়ে আমি সত্যি মাথা ঘামাতে বসিনি। কেনই বা বসব। তবু কখনো কখনো আমার মনে হয়েছে, রাজা কি আমাকে এমন চোখেই শুধু দেখে যে চোখে কোন মোহ নেই, তাপ নেই? এমন কথা আমার কেন মনে হয়েছে তা আমি জানি না। হয়ত মেয়ে বলে, হয়ত রাজার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার কথা ভেবে।

এ রকম কথা আমার মনে এলেই আমি প্রথমে কেমন আড়ষ্ট সঙ্কুচিত হয়ে উঠতাম। তারপর নিতান্ত যেন কৌতূহল থেকে সন্দেহ, শেষে অদ্ভুত এক আকুলতা, আগ্রহ।

আমি যদি অন্ধ না হই, কিংবা মনগড়া ভাবনা নিয়ে বিভোর না হয়ে থাকি তাহলে বলব, রাজা কখনো কখনো তার চোখের দৃষ্টি এমন করে মেলে ধরত আমার দিকে, তার হাত আমাকে এমনভাবে স্পর্শ করত যা একজন সাবালক পুরুষের। এতে কি আশ্চর্য হবার আছে।

আমি অন্তত হতাম না। একজন পুরুষ এভাবে একজন মেয়েকে দেখতেই পারে, বা একজন মেয়ে একজন পুরুষকে। আকাশে কখনো কখনো মেঘ হয়, বিদ্যুৎ চমকায়, তা বলে কি আকাশ শুধু মেঘ আর বিদ্যুতের? সে কি নীল নয়, সাদা নয়, তার তলায় কত রকম হাল্কা সুন্দর মেঘ কি ভাসে না। তার কালোর পটে কত তারা, কত জ্যোৎস্না, পূর্ণিমার চাঁদ। মানুষের মন তো একতরফা নয়, তার ইন্দ্রিয়গুলি তো সবসময় ক্ষুধা আর জ্বালা নিয়ে থাকে না। থাকে কি? তা যদি থাকত, তবে আমাদের সুখভোগ প্রশান্তি বোধ থাকত না।

একদিনের কথা বলি।

আমি কী খেয়ালে একটা হার পরেছিলাম। সচারাচর যেটা আমার গলায় থাকে সেটা পাল্টে অন্যটা।

রাজা এল সন্ধেবেলায়। আমি বসে আছি।

চা খাবার দিয়ে গেল পারুলের মা।

রাজা বাথরুম থেকে ফিরে এল। বসল। ওকে খেতে দিয়ে চা ঢালছিলাম। আমার খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ দেখি রাজা আমার গলা-বুকের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বুকের কাছে কাপড় টানলাম।

'ইন্দুদি।'

'বলো?'

'দারুণ হার পরেছ তো।'

'দারুণ কোথায়। পুরনো। আগেও পরেছি।'

'কই। চোখে পড়েনি। তোমায় একেবারে গর্জাস দেখাচ্ছে। ওটা কী হার?'

'কী জানি। দেখতে ভাল।'

'লকেটের পাথরটা কী?'

'ঝুটো মুক্তো।'

'চমৎকার দেখাচ্ছে। আঁচলটা সরাও, ভাল করে দেখি।'

'যাঃ।'

'আরে যাঃ কী! তোমার গলার একটা বিউটি আছে। প্লিজ সরাও। হারটা তো গলার জন্যে। আঁচলের জন্যে নয়। তুমি একেবারে জড়সড় মেরে থাকবে নাকি।'

আমি কী চাইছিলাম জানি না। আঁচলটা সরিয়ে দিলাম সামান্য। রাজা আমার গলা দেখছিল। গলার নিচেও ওর চোখ নামছিল বার বার। আর সেই চোখের দৃষ্টিতে কী ছিল আমি মেয়ে হয়ে স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম।

আর একবার বড় লজ্জার ব্যাপার হয়েছিল।

ঠিক জানি না কী কারণে আমার বুক ব্যথা শুরু হল। বুকের খাঁজের তলায় মাঝখানে প্রচণ্ড ব্যথা। কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম ব্যথায়। ছটফট করছিলাম।

রাজা বলল, গ্যাস্ট্রিক পেইন। বলে বাড়িতে হজম আর অম্বলের যত ওষুধ ছিল পর পর খাওয়াতে লাগল।

আমি একবার করে বিছানায় উঠে বসি, আবার শুয়ে পড়ি।

রাজা আমার পিঠ ডলে দিতে লাগল।

একটু কমে, আবার বাড়ে। শেষে আমার পক্ষে গায়ের জামা রাখাও কষ্টকর হয়ে উঠল। রাজাকে বললাম, তুমি একটু উঠে যাবে আমি জামা বদলাব। উঠে গেল রাজা। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গায়ে আঁচল জড়িয়ে জামা খুললাম। হাঁসফাঁস লাগছিল। নিচের জামাটা খুলে কোথায় ফেলি কোথায় ফেলি করতে গিয়ে খাটের তলায় ছুঁড়ে দিলাম। বুকটা আলগা হল। বার কয়েক নিশ্বাস নিয়ে আবার জামাটা পরলাম। আবার তেষ্টা পাচ্ছিল। কী যেন ঠেলে উঠে আসতে চাইছিল।

'একটু জল দেবে!'

কাছেই জল ছিল। জল দিল রাজা। এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেললাম খানিকটা। খেয়ে দু দণ্ড বসে শ্বাস নিচ্ছি, ভাবছি—বুঝি আরাম পাব,

হঠাৎ দেখি বুকের তলা থেকে টক জল ঠেলে উঠছে। গ্লাসটা তাড়াতাড়ি ওর হাতে ফেরত দিয়েছি কি আমার পেট বুক গুলিয়ে উঠল। নিশ্বাস বন্ধ করেও গা গোলানো ভাবটা দমাতে পারলাম না। বমি উঠে এল গলায়।...বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি নামবার জন্যে পা বাড়িয়েও নামা হল না, বুক গলা মুখ উপচে বমি এসে গেল।

গায়ের জামা, শাড়ির আঁচল, বিছানা বমিতে ভাসল। কুঁজো হয়ে বেঁকে আমি বমি করছি আর কাতরাচ্ছি। রাজা আমায় সামলাচ্ছিল। বুক ধরে থাকল এক হাতে, অন্য হাত পিঠে। ওর গায়েও বমির ছিটে।

খানিকটা সামলে নেবার পর রাজা আমাকে ধরে ধরে বাথরুম পর্যন্ত পেঁৗছে দিল।

পরের দিন সকালে আমি সুস্থ। চা খেতে খেতে রাজা বলল, 'ইন্দুদি, তুমি কাল আমায় আচ্ছা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে!

'কেন?'

'গ্যাসট্রিকের ব্যথা আমি দেখেছি। বাড়িতেই আছে আমার। তুমি যা করছিলে মনে হয় হার্ট-ফার্ট না গণ্ডগোল করে।'

'আমার এমন হয় না। এক আধদিন একটু আধটু ব্যথা হয় হয়ত —কাল যে কী হল!'

'হল মানে! প্রচণ্ড হল। তোমার জামা বুক পিঠ ঘেমে, ভিজে জলে একেবারে জবজব করছিল।'

আমি ওর দিকে তাকালাম। রাজা একটু হাসল। মনে পড়ল, কাল আমার বুক আমাতে ছিল না।

এরকম আরও আছে। অনেক ছোটখাট ঘটনা, মূহূর্ত। আমি তো ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে বসিনি, বা লজ্জা শরমে মরে যাইনি। অমন তো হয়ই, ওটা কি স্বাভাবিক নয়। রাজা যদি কখনো তার চোখ আর মনের তলা থেকে আমাকে তার পুরুষের স্বভাব নিয়ে দেখে থাকে—থাকুক, কী আর করা যাবে। আমিও কি তাকে দেখিনি।

কিন্তু যা বলছিলাম ওই এক দু দিন দু চারটে ঘটনা প্রমাণ করে না, রাজা আমাকে দেখলেই লোভী হয়ে উঠত। বা আমি তাকে দেখে নিজের বোধবুদ্ধি হারিয়েছি।

আমরা কোনো নোঙরামির মধ্যে নামিনি। এমনকি, এমনও হয়েছে রাত্রে আমরা ছাদে সতরঞ্জি পোত বসে আছি। আকাশভরা তারা। বাদলা বাতাস দিচ্ছে। ঝিঁঝির ডাক উঠেছে কোথায় কে জানে। রাজা আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

'ইন্দুদি, মাথার চুলগুলো আচ্ছা করে টেনে দাও তো।'

'টেনে ছিঁড়ে দেব।'

'পারবে না!···এসব হল হাইক্লাস চুল। ও তোমাদের বিজ্ঞাপন মার্কা ফলস হেয়ার নয়।'

'এই। আমার মাথার চুল....।'

'তোমার কথা আলাদা। তোমাকে কে বিজ্ঞাপন মার্কা বলেছে।'

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে চুলগুলো টেনে দিচ্ছিলাম, এত ঘন শক্ত চুল যে আমার আঙ্গুলগুলো ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল ওর চুলের বোঝায়।

'ইন্দুদি?'

'বলো।'

'তুমি কি সেন্ট মেখেছ!'

'সেন্ট!....আমি সেন্ট মাখি?'

'কী পাউডার মেখেছ।'

'যা রোজ মাখি।'

'ফিকে সুন্দর একটা গন্ধ বোরোচ্ছে। গন্ধটা চন্দন চন্দন। আমার মায়ের একটা চশমার বাক্স আছে। চন্দনের। স্টাইলের বাক্স, তাতে মায়ের চশমা থাকে। আমি এক একবার মায়ের চশমা কেড়ে নিয়ে

নাকে ঝোলাই। বলি, মা—তোমার চশমাতেও কী সুন্দর গন্ধ। মা আমার কান মলে চশমা কেড়ে নেয়। আমি নাকি ভেঙে ফেলব। আমি কি বাচ্চা। মায়েদের কোনো সেন্স থাকে না।' বলে রাজা হাসতে থাকে, আমার গলা কেন যেন বুজে আসে!

আট

রাজা এসে বলল, "কী রেডি হচ্ছ না?"

"আমি পারব না।"

"পারবে না কী! তেঁতুলতলা তো কাছে। আজ হাটিয়ায় ভেড়ার লড়াই হবে। রাম সিং ভার্সেস ছক্কু সেপাই।"

"তুমি যাও!"

"তুমি করছটা কী? চিঠি লিখছ? কাগজ কলম ছড়ানো।"

"না। লিখিনি।"

"লিখো না। তোমার ওই কলপ-লাগানো বন্ধু—কী নাম যেন, নন্দিতাদি, ওকে দেখলে আমার মেয়ে-পুলিশ বলে মনে হয়।"

"আঃ!···কী বলো।"

"ওই সব কাগজ কলম চিঠি ফেলে দাও, চলো।···বাইরে শেষ দুপুরের রোদটা দেখেছ, আহা বিউটিফুল। বাড়ির সামনে আতা ঝোপটার কাছে যাও—বিশ-ত্রিশটা প্রজাপতি নাচছে···। চলো, ইন্দুদি।"

"আজ নয় গো, পরের দিন যাব। তুমি ঘুরে এসো।"

"দূর। তুমি···"

"এসো না ঘুরে। সন্ধেবেলায় বরং বেরুবো।"

"তা হলে ছেড়েদি।"

"যাও না তুমি।"

"একলা ভাল লাগে না।"

কী মনে হল, বললাম, "ঠিক আছে। আমি এইভাবেই বেড়িয়ে পড়ব। রাজি!"

রাজার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। যাবার আগে কাগজ কলম চিঠি আর তোলা হল না। পড়েই থাকল। কীই বা তুলবো। আমি তো নন্দিতাদিকে কোনো চিঠি লিখিনি। তার কাছে আমার কোনো জবাবদিহি নেই। তবু কেন কে জানে, কাগজ কলম টেনে নিয়েছিলাম। নিজের মনে নিজেরই কিছু কথা লিখে রাখতে। লেখা হয়নি। হল না।

গায়ের শাড়িটা গুছিয়ে উঠে পড়লাম। মাথার চুল ছড়ানোই থাকল। একটা পাতলা চাদর নিলাম গায়ে দেব বলে।

হাঠ মাঠ ঘুরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রোদ পালিয়েছে। আলো মরে গিয়েছে। একটু পরেই অন্ধকার নেমে যাবে।

অন্য দিন সন্ধের মুখে আমরা যাই বাইরে ঘোরাফেরা করতে। আজ আর বাইরে যাবার কারণ নেই। ক্লান্তিও লাগছিল। হাটেমাঠে ঘোরাফেরাও কম হয়নি।

খানিকটা জিরিয়ে গা হাত ধুয়ে শাড়ি জামা পাল্টালাম। সন্ধে গেল। কাজের মেয়েটা চলে গিয়েছে।

চা তৈরি করে রাজাকে ডাকলাম। এসো।

রাজারও প্যান্ট জামা বদলানো হয়ে গিয়েছে। একেবারে সাফসুফ।

আমার ঘরে বসে চা খাওয়া হচ্ছিল। এ বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই। লণ্ঠনের আলো।

চা খাওয়া শেষ হল।

বাতাস আসছিল শীতের। রাজা উঠে গিয়ে একটা জানলা বন্ধ করে দিল। অন্যটা খোলা থাকল।

আমি ওকে দেখছিলাম। দেখতে দেখতে মনে হল, কথাগুলো আজ এখন শেষ করে নিই। হয়ত এই সময়টাই ভাল, কথাগুলো এখন

মুখে আসবে, পরে নাও আসতে পারে। যা যখন আসবে তখন আমার মন এখনকার মতন অনাবৃত নাও হতে পারে।

রাজা একটা সিগারেট ধরালো। ও কমই সিগারেট খায়।

"রাজা!"

রাজা আমার দিকে তাকাল।

বিছানার মাথার দিকে আমি বসে, বালিশটা আমার পাশে। বিছানায় এখন আর কিছু পড়ে নেই। নন্দিতাদির চিঠি, আমার কাগজ কলম।

"বলো" রাজা বলল।

আমি কেমন করে কথা শুরু করব বুঝতে পারছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল, সরাসরি স্পষ্ট করে কথা বলাই ভাল।

"কী হল! রাজা বলে চুপ করে গেলে?"

"না। চুপ করে যাইনি।...বলছি।"

"বলো।"

"আমরা এখানে আর কত দিন থাকব?"

রাজাকে বলার সময় বুঝিনি, কথাটা মুখে এসেছিল, বলছি। বলার পর মনে হল, 'এখানে' শব্দটার কি অন্য অর্থও আছে? আমি আর রাজা কি এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি যার পর আমাদের হয় এগুতেই হবে, নয় পেছুতে হবে।

রাজা বলল, "কেন! জায়গাটা খারাপ লাগছে? এমন ফার্স্ট ক্লাশ জায়গা..."

"অনেকদিন হয়ে গেল!"

"অ-নেক দিন কই! প্রায় দেড় মাস।"

"না।"

"না!...কী বলছ তুমি? অঙ্কটাও জান না? এসেছি পুজোর পর ...আর এখন তোমার কী না"বলে রাজা আঙুল গুনে হিসেব করতে লাগল, "আজ নিয়ে আটত্রিশ দিন।"

"আরও বেশি, অনেক বেশি—!"

"বেশি !" রাজা অবাক। আমাকে দেখতে দেখতে বলল, "তোমার কী মাথা..."

"আজ ছ'মাস।"

"ছ' মাস !" রাজা বেতের মোড়াটা পেছন দিকে সরিয়ে দিল ঠেলে। আমায় দেখছে, না, ভূত দেখছে বোঝা গেল না। বলল, "তুমি মজা করছ !"

আমি বললাম, "না।...তুমি বুঝতে পারছ না ?"

"না," মাথা নাড়ল রাজা।

অল্প চুপ করে থেকে আমি বললাম, "তুমি কবে এসেছ !...আমি বলব !"

"ইন্দুদি, তুমি কি সিদ্ধিমিদ্ধি খেয়েছ..."

"তুমি এসেছ আমার স্বামীর চলে যাবার দিন থেকে।"

রাজা যেন বুঝতেই পারল না কথাটা। সে তাকিয়ে থাকল। তার চোখের পাতা পড়ল না। সিগারেটের ধোঁয়া ওর মুখের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

আমি বললাম, "আমার কাছে তুমি সেই দিনটি থেকে এসেছ। শ্মশান থেকে। শ্মশান থেকে বাড়ি। তার আগে তুমি এসেছ, সে আসা কড়া-নাড়ার মতন, তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে। আমার স্বামীকে তুমি পৌঁছে দিতে এসেছিলে..."

রাজা উঠে গিয়ে অন্য জানলা দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। "তোমার হয়েছে কী ! ভয় পেয়েছো ?"

"না। আমি তোমার সঙ্গে ক'টা কথা বলতে চাই।...আমার তো সব মনে আছে, রাজা। উনি ওভাবে আচমকা চলে গেলেন। আমি ভাবিনি মানুষটা ওভাবে যাবে। এ যেন আকাশ থেকে বাজ, পড়া।"

রাজা দাঁড়িয়ে থাকল।

"উনি গেলেন। আর তুমি শ্মশান থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে এলে।

আমার বাড়িতে। তোমার মনে পড়ে না, আমি যখন একেবারে নিঃস্ব হয়ে বারান্দায় বসে আছি—শ্মশান থেকে ফিরে, সকলেই চলে গেল, শুধু তুমি থাকলে! আমি কাঁদছিলাম, আর তুমি আমার পায়ের কাছে বসে আমার হাঁটুতে তোমার মুখ চেপে ধরে হঠাৎ· ·”

“ইন্দুদি। তুমি···আমি এবার বুঝতে পারছি।”

“পারবে বইকি। কিন্তু কতটা পারবে?”

“বেশ, তুমি বলো।”

“সেদিনই তুমি আমার কাছে এসেছ।···আমি তো তোমায় বোঝাতে পারব না, তোমাকে আমি কেমনভাবে নিয়েছি সেদিন।”

রাজা এগিয়ে এসে বিছানায় বসল। আমার কাছাকাছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। রাজা কোনো কথা বলল না। আমিও চুপ।

শেষে আমি বললাম, “আমার কথা কি তুমি বুঝবে।···তবু তোমায় বলছি—আমার সেদিন ভেসে যাবার অবস্থা। কেউ নেই, কিছু নেই। সব দিক ফাঁকা। হাত বাড়িয়ে ধরার কেউ নেই। বাবা নয়, বোন নয়, বন্ধু নয়, সন্তান নয়।”

“ইন্দুদি, আমি জানি। তুমি সেদিন একেবারে একা, নিঃসঙ্গ ছিলে। তোমার দুঃখ আঘাত বোঝার মতন কেউ ছিল না।”

“তুমি তখন এসেছিলে। আমি আমার সারা জীবনে এমন করে কাউকে আসতে দেখিনি, রাজা। কাউকে এমনভাবে কাছে পাইনি।”

“ইন্দুদি···।”

“আমি মিথ্যে বলছি না। তুমি আমার কথা জান। আমার জীবনের সব কথাই বলেছি তোমায়। আমার মা বাবা বোন—এদের কথাও তোমার জানা।”

রাজা মাথা হেলিয়ে বলল, সে জানে।

আমি বললাম, “আমার স্বামীকেও তুমি দেখেছ। তবে সে শুধু চোখের দেখা। তুমি ওঁকে এনে বাড়িতে পৌঁছে দিলে, ঘণ্টা দুই খানিকটা হুঁশ থাকল তারপর বেহুঁশ।”

"সত্যি ইন্দুদি, ভাবলে এখনও আমার কাছে ব্যাপারটা কেমন লাগে। জানি না, চিনি না, এক ভদ্রলোককে বাড়ি এনে পৌঁছে দিলাম, আর মাত্র দুদিনের মধ্যেই তিনি চলে গেলেন। আশ্চর্য।...কী দরকার ছিল...।"

"জানি না। এক একসময় মনে হয়েছে হয়ত আমার কপালে—"

"কপালে তোমার দুঃখ ছিল। তুমি তো তোমার স্বামীকে নিয়ে সুখেশান্তিতেই বেঁচে থাকতে পারতে। পারলে না! কিন্তু কী করবে ইন্দুদি, এরকম তো হয় জগতে। আমার বেলায় দেখছ না। নিজের বাবাকেই চোখে দেখলাম না।"

আমি একটু পাশ ফিরে বসলাম, দেখছিলাম রাজাকে। ওকে যা বলতে চাইছি, বলতে পারছি না।

"রাজা!"

"উঁ!,'

"আমার স্বামীকে তুমি রাস্তা থেকে বাড়িতে এনে দিয়েছিলে। তিনি চলে গেলেন। তুমি আমার বাড়িতে জায়গা করে নিলে। এক একসময়ে আমার মনে হয় এর মধ্যেও যেন কোনো ভাগ্যের হাত ছিল।"

"ভাগ্য। না তোমার দুর্ভাগ্য।"

"কে জানে।...আমার স্বামীর কথা তুমি সবই জান। বিয়েটা আমাদের হয়ে গিয়েছিল। আমিও ভাবিনি। আমার তখন বত্রিশ বছর বয়েস, ওনার আটত্রিশ। ছ'বছরের বড়।...কিন্তু বছরের হিসেবটা বড় কথা নয়। উনি যেন স্বভাব-চরিত্রেও আমাকে ছাড়িয়ে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিলেন। অমন ভদ্র, সভ্য, শান্ত, নম্র মানুষ সহজে দেখা যায় না। ওঁকে আমি মাথা গরম করে চেঁচামেচি করতে দেখিনি, চড়া গলায় কথাও বলতেন না, রাগারাগি ছিল না, বিরক্ত হলেও স্পষ্ট করে বোঝাতেন না। উনি ছিলেন ঠাণ্ডা ধাতের, ওঁর মধ্যে তাপ-উত্তাপ দেখা যেত না। ভাল মানুষ ভদ্র শান্ত, মানুষ, কিন্তু আমার স্বামীর মধ্যে কী

ছিল না—আমি তোমায় কেমন করে বোঝাই।"

রাজা কী মনে করে বলল, "দরকার নেই বোঝাবার।··তুমি আমায় কী বলতে চাইছিলে সেটা বলো!"

আমি রাজার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ও আমার চোখে চোখে তাকিয়ে আছে। লণ্ঠনের আলো বড়ই অনুজ্জ্বল। আমাদের পরস্পরের মুখের সবটাই কি আমরা দেখতে পাচ্ছি! রাজা কি বুঝতে পারছে, আমার মুখ আজ এখন কেমন হতশ্রী হতাশ দেখাচ্ছে!

"তুমি—তোমায় কী বলতে চাইছিলাম—বুঝতে পারছ না?"

"না।"

"তুমি কি কোনোদিনই ভাবনি কিছু? মনে হয়নি তুমি কী আমি কী?"

রাজা যেন খুব তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে দেখার, বোঝার চেষ্টা করল। মাথার চুল ঘাঁটল নিজের। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল, "দেখি তোমার হাতটা।"

আমার হাত টেনে নিয়ে নিজেদের দু হাতের মধ্যে ধরে থাকল। ওর হাত এই শীতের দিনেও কেমন উষ্ণ। আমার হাত কী ঠাণ্ডা! ওর হাতের আঙুল দিয়ে আমার আঙুলগুলোকে জড়ালো, চাপ দিল। কিছুক্ষণ এইভাবে বসে থাকার পর বলল, "আমরা কি ফিরে যাব?"

আমি হ্যাঁ না কিছুই বললাম না। ওর দিকেও আমার চোখ ছিল না। আলোটা আমার বিছানার কাছাকাছি। চোখে লাগছিল।

রাজা আমার হাত টেনে নিয়ে তার মুখের কাছে ধরল। চাপ দিল। চোখের ওপর রাখল। তারপর বলল, "তুমি একটু শুয়ে থাকো। কাঁপছ। আমি আসছি। গায়ে ঢাকা দিয়ে শুয়ো।"

নিজেকে ঢেকে ঢুকেই শুয়ে থাকলাম। রাত বেড়ে যাচ্ছিল। খোলা জানলা দিয়ে হিম ঢুকছিল। শীত। রাজার গলা পাচ্ছিলাম না। সাড়া বাড়ি নিস্তব্ধ। লণ্ঠনের আলোটাও ম্লান হয়ে আসছিল।

আবার যেন কাঁপুনি এল। গায়ের কম্বলটা টেনে নিলাম গলা

পর্যন্ত, আশেপাশ কোনো ফাঁকা রাখলাম না। নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকলাম। শুধু আমার নিশ্বাস পড়ার সময় শব্দ হচ্ছিল।

এইভাবেই না আমি শুয়ে আছি সারা জীবন। একটা আবরণে বরাবরই নিজেকে ঢেকে রাখতে হয়েছে।

রাজাকে আজ যেন এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম, অন্যভাবে। বলতে চাইছিলাম, রাজা, জীবনের কাছে আমার কিছু পাওয়া হয়নি। আমারই কুণ্ঠায় কিংবা অযোগ্যতার জন্যে। কিংবা আমার দুর্ভাগ্যের কারণে। আমার কৈশোর নিতান্তই দিনের হিসেব, মাস বছরের হিসেব। আমার যৌবন কবে এল, কখন তার ফুরিয়ে যাবার বেলা হল তাও বুঝলাম না। আমার স্বামী আমাকে ঘরবাড়ি, সাজসজ্জা, বিছানা দিয়েছিলেন—কিন্তু তাঁর মধ্যে তুমি ছিলে না। তুমি আমার কাছে তোমার যৌবনের ঝাপটা নিয়ে এসেছিলে, বর্ষার জলের ঝাপটা, বসন্তের বাতাসের দমক। তোমার আনা আচমকা ঘূর্ণিতে আমি যে ধুলোবালি শুকনো পাতার মতন ঘুরপাক খেয়েছি। আমি আগে কোনোদিন অনুভব করতে পারিনি এমন এক ঝড়ের দমকা। যে যৌবন আমার দেহ আর মনের মধ্যে ভিখিরির কাঁথার মতন পড়ে থাকল, যে কোনো-দিন নিজেকে জানাতে পারল না, কেউ তাকে জানাল না, ইন্দু—তুমি যুবতী, তুমি তোমার মধ্যে মরে যাচ্ছ কেন, তুমি তো বঞ্চিত হচ্ছ, তোমার মধ্যে এই ব্যর্থতার কোনো মূল্য নেই।

আমার স্বামী যখন চলে গেলেন—তখন আমার যৌবনও শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় তুমি এলে রাজা। আমি তোমার মধ্যে সেই যৌবনকে দেখলাম যার স্বাদ আমি কোনোদিন পাইনি। আমি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে তোমার সেই উগ্র স্বাভাবিক যৌবনকে দেখতাম। অনুভব করতাম তার ভাল মন্দ। তোমার মায়া মমতা সহানুভূতি, ভালবাসা, কর্তব্য বোধ আমি দেখেছি। আমাকে আগলে রাখার মধ্যে কোনো মিথ্যে ছিল না—তোমার। আবার এও আমি জানি, তুমি সময়ে সময়ে লোভী হয়ে উঠেছ, আমার কাছ থেকে নিজেকে লুকোবার

চেষ্টা করেছ। তুমি তো চতুর, বুদ্ধিমান, শয়তান হবার জন্যে আমার কাছে আসনি, তুমি যা সেইভাবেই এসেছ। তাতে তোমার লজ্জার কিছু নেই, আর আমারও সংকোচের কিছু থাকল না।

নন্দিতাদি তার চিঠিতে লিখেছে, আমার নাকি মতিভ্রম ঘটেছে, আমি একটা চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলেকে নিয়ে মত্ত হয়ে উঠেছি। সে লিখেছে যে বয়েসে মেয়েরা আগুনে ঝাঁপ দেয় সেই বয়েস পেরিয়ে আসার পর এ আমি কোন আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছি। এই নোংরামির মধ্যে আমি কেমন করে নামলাম।

নন্দিতাদিকে আমি কোনো চিঠির জবাব দিইনি। দেব না। কারও কাছে আমার কোনো কৈফিয়ত দেবার নেই। এমনকি আমার পরলোক-গত স্বামীর কাছেও নয়।

নিজের কাছেই মানুষ মিথ্যে সাজাতে পারে না। নিজের কাছেই সে তার পাপের কথা স্বীকার করতে পারে।

আমি আমার কাছেই বলছি, আমি ওই রাজার যৌবনের ভালমন্দ দুইই ভালবেসেছি। আমার কাছে শুধু রাজা নয়, একটা চব্বিশ পঁচিশ বছরের তাজা ছেলে নয়, ও তারও বেশি হয়ে দেখা দিয়েছিল। মেঘ বৃষ্টি ঝড়ের রাত শেষ হয়ে যাবার পর মানুষ যদি সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখে—রোদে ভরা ঝরঝরে দিনের আলোয় একটা পাখি এসে তার জানালায় বসেছে—সে যেমন খুশিতে আনন্দে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে পাখিটার দিকে, জানলার বাইরে রোদের দিকে, আমি সেইভাবেই যেন রাজাকে পেয়েছিলাম।

ও আমার অন্তরের কোন্ আড়াল থেকে আনন্দ হয়ে উঠে এসেছিল কেমন করে বোঝাব। কাকেই বা! আর কেনই বা বোঝাব। আমি আমার কাছে বুঝলাম। এর চেয়ে বড় সত্য কী আছে।

● সমাপ্ত ●